মকতুবাতে
মাসুমীয়া
হজরত
খাজা মোহাম্মদ মাসুম (রহঃ)

হে আমাদের প্রতিপালক,
তুমিতো কোনো কিছুই সৃষ্টি করোনি অনর্থক।
তুমিই পবিত্র। আমাদের পরিত্রাণ দাও তোমার অসন্তোষের আজাব থেকে।
— সূরা আলে-ইমরান

মকতুবাতে মাসুমীয়া

মূলঃ হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম
সেরহিন্দী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ আনিসুর রাহমান

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মকতুবাতে মাসুমীয়া
[প্রথম খণ্ড]

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

মুদ্রণ ঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি ফকিরেরপুল, ঢাকা–১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদ ঃ
আব্দুর রোউফ সরকার

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ ইং
তৃতীয় প্রকাশঃ আগস্ট, ২০০৮ ইং

বিনিময় ঃ আশি টাকা মাত্র।

MUKTUBATE MASUMIA: The selected sacred letters of Hazrat Khwaza Mohammad Masum (Rh.) translated into Bengali by Anisur Rahman and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia. Exchange Tk. 80/- U.S.$ 10.00

ISBN 984-70240-0024-5

সে আলোর বিকিরণ ছড়িয়ে রয়েছে সবখানে–
রওনক তার রওশন করে দূর আসমানে।
জেগে ওঠে প্রতি–ধূলিকণা সারা বিশ্ব-চরাচরে-
সে আলোর খোঁজে ছুটে আসে মখলুক সবভুলে,
তৃষিত হৃদয় করে পান জম্ জম্ প্রাণ ভরে–
আলোর ইশারা ওঠে জেগে জীবনের কুলে কুলে/
কোকাফ আঁধারে সে কিরণ ভীষণ আঘাত হানে
সে আলোর বিকিরণ তিমির-হনন সবখানে।

সে আলোর বিকিরণ জড়িয়ে রয়েছে সবখানে
জীন্দেগির পরতে পরতে বিশ্বাসে আর বিধানে/

আঁধারের ভয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘোর অমানিশা নাশি-
হাজির হয়েছে সুবে-সাদেকের পবিত্রতা আসি,
বেরিয়ে এসেছে দীপ্ত তেজ কুয়াশার ঝাঁপ খুলি
দেখা যায় ঐ দিক-দিগন্ত চেয়ে আছে মুখ তুলি/
সওদার ভারা উঠিছে ভরিয়া ইশকের টানে-
সে নূরের জ্যোতিঃ পৌঁছে গেছে হৃদয়ের সবখানে/

সে আলোর দ্যুতি আজ ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে
সেরহিন্দ নয়, হিন্দুস্তান নয়-তামাম জাহানে/

প্রবৃত্তিপীড়িত পৃথিবীবাসীদের আরোগ্য-অভিযানে সঠিক নেতৃত্ব যাঁরা দিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁরাই নবী এবং রসুল-অন্য কেউ নয়। জীবনকে পূর্ণ নিরাময় করতে পেরেছিলেন তাঁরাই, যাঁরা ছিলেন তাঁদের সফল অনুকারক। নিষ্ফলতায় নিমজ্জিত হয়েছে বিরুদ্ধবাদীরা। প্রকৃতপক্ষে নবী রসুলদের জ্যোতির্ময় আদর্শের বিরুদ্ধাচরণকারীরাই যুগে যুগে ডেকে এনেছে পৃথিবীতে জীবনবিমুখতার দীর্ণ দৃষ্টান্ত বার বার। তবু থেমে থাকেনি এই মহাঅভিযান আজো। হজরত আদম আ. থেকে শুরু শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিলো যে জীবন-শুশ্রূষার সংগ্রাম– তার ধারাবাহিকতা বহমান এখনো। মহানবী মোহাম্মদ স. এর উম্মতগণের মধ্য থেকে দ্বীনদার আলেম এবং কামেল পীর দরবেশরা এখনো করে চলেছেন এই দুর্বার অভিযানের সফল সেনাপতিত্ব। নবী করিম স. এর এই সব উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত এ অভিযান চলবে। চলবেই।

পতনের পথের পথিকগণ, থামুন। ভেবে দেখুন একটি বারের জন্য– কী বিস্তর ব্যবধানে সরে এসেছি আমরা সত্য পথ থেকে। অনিকেত জীবন থেকে ফিরে আসবার সময় হয়নি কি এখনো? নিশ্চিত জীবন লাভের উদ্বেল বাসনায় এখনো কি অন্তরে জ্বলে উঠেনি অনুতাপের অনির্বাণ আগুন? পথ প্রদর্শক পীর মোর্শেদ খুঁজবো কবে? কবে আমরা গ্রহণ করবো বায়াতের পবিত্র শপথ। দ্বিধার দেয়াল ভেঙ্গে কতোদিন পরে আর আমরা অর্জন করবো আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার? প্রবৃত্তির প্রতাপ আর শয়তানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কবে আমরা পালন করতে শিখবো খাঁটি বিশ্বাসীদের মতো প্রতিবাদী ভূমিকা?

প্রিয় বিশ্বাসী ভ্রাতা ভগ্নিবৃন্দ। সমকালীন শত্রুদেরকে চিনতে হবে আমাদেরকে। কাফের মোশরেকদেরকে চেনাতো সহজই। কিন্তু মুসলমান মুখোশধারীদেরকে চেনা সহজ নয়। শিয়া, কাদিয়ানি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতো মওদুদী মতবাদের অনুসারীরাও যে পথভ্রষ্ট একটি সম্প্রদায়– সে কথাও আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জেনে নিতে হবে। হজরত রসুলেপাক স. এর সম্মানিত সাহাবাগণের প্রতি অপবাদ আরোপকারী এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়টি সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে সবাইকে। আমাদের ইমানকে হেফাজতে রাখার জন্যই তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে আমাদেরকে। এটা যে আমাদের ইমানী দায়িত্ব– সেকথা ভুলে গেলে চলবে না কিছুতেই। একথা নিশ্চিত যে মওদুদী ফেৎনাই বর্তমান জামানার প্রধানতম ফেৎনা।

শত সহস্র শোকরানা সেই পাক জাত আল্লাহ্ সোবহানাহু তায়ালার মহান দরবারে যিনি আমাদেরকে মকতুবাতে মাসুমীয়া ১ম খণ্ড বইটি চতুর্থ বারের মতো প্রকাশ করবার সুযোগ দান করেছেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী র. ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দী র. এর তৃতীয় সাহেবজাদা এবং তাঁর প্রধান খলিফা। বহু বৈশিষ্ট্যধারী বাদশাহ্ জিন্দা পীর আওরঙ্গজেবের পীর ও মোর্শেদ হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর পবিত্র কিছু আধ্যাত্মিক সম্পদসমৃদ্ধ চিঠিপত্রের সমাবেশ এই মকতুবাতে মাসুমীয়া বইখানি মারেফতের পথের পথিকগণের জন্য অবশ্য পাঠ্য– একথা বললে কিছুতেই বেশী বলা হবে না। বরং কমই বলা হবে– একথা এ পুস্তকের পাঠকমাত্রই স্বীকার করে নিবেন, এ বিশ্বাস করা যায় সহজেই।

প্রায় তিন শত বছর পর এই অমূল্য গ্রন্থখানির প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবার তৌফিক লাভ করেছি আমরাই। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য। সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পেয়ারা হাবীব হজরত মোহাম্মদ স., তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধরগণ এবং সম্মানিত সাহাবাবৃন্দের প্রতি। আমীন।

প্রারম্ভে এবং অবশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাদের বই

- তাফ্‌সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন্‌ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- নকশায়ে নকশ্‌বন্দ
- চেরাগে চিশ্‌তী
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- নূরে সেরহিন্দ
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- মহাপ্রেমিক মুসা
- তুমিতো মোর্শেদ মহান
- নবীনন্দিনী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ্‌ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- রমজান মাস
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী র. ১০০৭ হিজরীর ১১ই শাওয়াল সোমবার সেরহিন্দ শরীফের নিকট বস্‌সি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী র. এর তৃতীয় সাহেবজাদা ও খাস্ মোজাদ্দেদিয়া তরিকার অন্যতম প্রধান খলিফা ছিলেন।

ইসলামের গৌরব, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, সৌন্দর্য, ইমানের প্রতি অটল দৃঢ়তা, শরীয়তের প্রতি অনড় নিষ্ঠা, মাখলুকের প্রতি গভীর ভালবাসা, মানবতা, মহানুভবতা, উদারতা, বিনয়, দয়াদাক্ষিণ্য এবং মারেফতের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ– এক কথায় ইসলামের সমস্ত মহৎ গুণাবলী আল্লাহ্‌তায়ালা এই বংশধারার মধ্যে তাঁহার অনন্ত রহমতের ধারায় ফল্গুধারার মত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। হজরত খাজা মাসুম র. ছিলেন ইসলামের সেই নির্ভীক খাদেমে দ্বীন মহাপরাক্রমশালী আমিরুল মোমেনিন হজরত ওমর ফারুক রদ্বিআল্লাহুতায়ালা আনহুর বংশধর। হজরত ওমর রা. এর কাল হইতে কালক্রমে অষ্টবিংশ পুরুষে উপনীত হইয়া বিখ্যাত এই ফারুকী বংশে হজরত খাজা মাসুম র. জন্মগ্রহণ করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার অপার মহিমা বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। তাঁহার গোপন ইচ্ছাসমূহ যখন সময়মত একে একে প্রকাশিত হইতে থাকে তখন তাঁহারই প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে আপন আপন সীমার মধ্যে থাকিয়া সেই অনন্ত রহস্যের কিছু কিছু কচিৎ কেহবা উপলব্ধি করিতে পারেন।

সেরহিন্দ নামক স্থান সম্পর্কে পূর্বে কেহ কোন কিছু অবগত ছিলেন না। কোন বসতি বা লোকালয় ছিলনা সেখানে। ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ বাঘের আবাসভূমি 'সেহেরেন্দ' হইতে এই সেরহিন্দ শরীফের উৎপত্তি বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছা করিলেন সেরহিন্দের নূতন মাটিতে তাঁহার গুপ্ত রহস্যাবলীসম্পন্ন মারেফতের মূল্যবান চারা রোপন করিবেন। কিন্তু সেই চারা যে খালি চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য সেই চারাকে যত্নের সহিত লালন-পালন করিয়া বড় করিবার জন্য যে উপযুক্ত খাদেমের দরকার। যাহার দেখা-শোনায়, আদর-যত্নে ও নিত্যদিনের পরিচর্যায়, সহবত আর মহব্বতের গুণে দিন-বা-দিন সেই

চারাগাছ শাখা প্রশাখায় ধীরে ধীরে পল্লবিত হইয়া উঠিবে আপন মহিমায়। গায়েবী ফয়সালা দ্বারা ঠিক হইয়া গেল, সেরহিন্দের এই জনবসতিহীন আনকোরা মাটিতে সেই অদৃশ্য চারা গাছের লালন-পালন করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইবে ঐতিহ্যবাহী ফারূকী বংশকে।

সুদূর আরবে ইসলামের প্রথম চারা যে কয়জন সৌভাগ্যশালী বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সযত্নে লালন-পালন করিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান সেই নির্ভীক অবিচল ফারূকী বংশেরই একজন কামেল অলি ও মারেফতের অক্লান্ত সাধক দ্বারা সেরহিন্দের ভিত্তি রচিত হইবে– অদৃশ্যলোক হইতে এই মর্মে আদেশ জারি হইয়া গেল। সেরহিন্দের বুনিয়াদ খাড়া করিবার ভার পড়িল সত্যসন্ধানী বুজুর্গ হজরত ইমাম রফিউদ্দিন র. এর উপর– যিনি ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ।

যেভাবে সেরহিন্দ শরীফের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহার সে ইতিহাসও আল্লাহ্তায়ালার অনন্ত হেকমত, রহমত ও গুপ্ত রহস্যের নিদর্শনে পরিপূর্ণ।

তখন দিল্লীর বাদশাহ্ ফিরোজশাহ্ তোঘলকের রাজত্বকাল। একদা রাজকার্য উপলক্ষে কয়েকজন শাহী কর্মচারী লাহোর হইতে দিল্লী আসিতেছিলেন। চলার পথে একজন কর্মচারী কোন এক স্থানে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তিনি ছিলেন একজন কাশফ্ধারী কামেল বুজুর্গ। সেই কামেল বুজুর্গ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিলেন, সেখান হইতে এক নূরের আলোকধারা সমগ্র বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে– এমন কি ঊর্ধ্বমুখী একাংশের আলোকরশ্মি দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার আরশ পর্যন্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সঙ্গীদের কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি তাঁহাদের সঙ্গে দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন এবং নিজ মোর্শেদ হজরত সাইয়েদ জালালউদ্দীন বোখারীর খেদমতে তিনি পথে-দেখা সেই নূরের খবর বর্ণনা করিলেন।

হজরত সাইয়েদ জালালউদ্দীন বোখারী ওরফে মখদুম জাহানিয়া র. সেই আমলের আলা-দরজার অলি-আল্লাহ্ ছিলেন, যাঁহার অন্তর আল্লাহ্তায়ালার মারেফতের নূরে ভরপুর ছিল। জনবসতিহীন স্থানে এই ধরনের অসাধারণ নূরের বিকাশ সম্পর্কে অবহিত হইয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তরিকার মাধ্যমে সিনা-বা-সিনা যে অসিয়ত দীর্ঘকাল হইতে সুরক্ষিত অবস্থায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে সেই অসিয়তের কথাঃ আখেরী নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মুজতবা স. এর জামানা হইতে হাজার বৎসর পর হিন্দুস্তানে এমন একজন অসাধারণ অলিআল্লাহ্ এবং আল্লাহর খাস্ নির্বাচিত দাস জন্মগ্রহণ করিবেন, যিনি বেলায়েতের এবং নবুয়তের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হইবেন। তিনি হাজার বৎসরের মোজাদ্দেদের সুকঠিন দায়িত্ব বহনকারী বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী।

দিল্লীর বাদশাহ্ ফিরোজশাহ্ তোঘলককে এই গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করিয়া হজরত মখদুম জাহানিয়া র. সেই স্থানে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার জন্য বাদশাহ্কে বলিলেন।

বাদশাহ্ ফিরোজশাহ্ তোঘলক অত্যন্ত ধর্মভীরু ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। হজরতের হাতে তিনি বায়াতও হইয়াছিলেন। পীর কেবলার অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি তৎক্ষণাৎ উজির ফতেহ্উল্লাহকে সেরহেন্দ জঙ্গলের সেই স্থানে অনতিবিলম্বে একটি কেল্লা নির্মাণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

উজির খাজা ফতেহউল্লাহ্ কালবিলম্ব না করিয়া বহু লোকজন সমভিব্যাহারে সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন এবং স্থান নির্বাচনের পর কেল্লা নির্মাণের কাজ শুরু করিলেন।

কেল্লা নির্মাণ করিতে যাইয়া উজির ফতেহউল্লাহ অদৃশ্য বিপদের সম্মুখীন হইলেন। শত শত লোকজনের সম্মিলিত পরিশ্রমে সারাদিন যে পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হইত, রাত্রে সকলের অগোচরে তাহা নিঃশব্দে ধ্বসিয়া পড়িত। রাত্রে পাহারা বসাইয়া এবং বহু চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইল না। প্রতি রাত্রে ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকে। রাত্রি শেষে দেখা যায়, কেবলমাত্র বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তুপ ছাড়া সেখানে পূর্বদিনের নির্মাণ কার্যের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নাই। লোকজনের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং রাজকোষের অর্থ প্রতিদিন বরবাদ হইয়া যাইতেছে। পর পর কয়েকদিনের পৌনঃপুনিক চেষ্টার পর উজির প্রমাদ গণিলেন। ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গের কারণে তিনি মুষড়িয়া পড়িলেন। অবশেষে লোকজনদের সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি দিল্লী ফিরিয়া গেলেন এবং সম্রাটকে সেই অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে সবকিছু অবহিত করিলেন।

সম্রাট ফিরোজশাহ্ বুঝিতে পারিলেন, এই ঘটনার সহিত হয়ত কোন অদৃশ্য রহস্যের যোগ রহিয়াছে। তিনি তাঁহার মোর্শেদকে ঘটনা সম্পর্কে সবকিছু অবহিত করিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ শোনার পর পীর-মোর্শেদ হজরত মখদুম জাহানিয়া র. উজিরের ছোট ভাই ও তাঁহার প্রিয় খলিফা হজরত ইমাম রফিউদ্দীনকে উক্ত কেল্লা নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করিলেন।

জনবসতিহীন জঙ্গলের পবিত্র মাটিকে আল্লাহ্তায়ালা এতকাল পরে বসতি স্থাপনের জন্য মনোনীত করিয়াছেন– যেখান হইতে দ্বীন ইসলাম ও মারেফতের পবিত্র নূর, ফারূকী বংশের মাধ্যমে দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িবে। সেরহিন্দের সেই ভিত্তি স্থাপনের সূচনায় তাই ফাঁকি বা অবহেলার কোন অবকাশ ছিল না।

সম্রাটের লোকজন হজরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর র.কে কুলি ভাবিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে বেগার খাটাইত। বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার প্রতি এই অন্যায়ের প্রতিফল হিসাবে তাঁহারই কারামতে কেল্লা নির্মাণের জন্য দিনের সমস্ত কাজ রাত্রে সকলের অগোচরে পণ্ড হইয়া যাইত।

পীরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া হজরত শাহ্ রফিউদ্দীন র. সেখানে পৌঁছানোর পর আল্লাহ্পাকের ইচ্ছায় মোরাকাবার মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। শত শত লোকের মাঝেও তিনি হজরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর র.কে চিনিতে পারিলেন। তিনি নিজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও আজিজির সহিত ঘটনা সম্পর্কে বার বার দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট মাফ চাহিলেন।

হজরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর র. তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় কেল্লা নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য তাঁহাকে এজাজত দিলেন।

তিনি হজরত রফিউদ্দীন র.কে বলিলেন, আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশেই আপনি এখানে আসিয়াছেন। আপনার বংশে এখানে এমন এক অলি-আল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করিবেন, যাঁহার বদৌলতে দ্বীন ইসলামের মধ্যে প্রবিষ্ট সমস্ত কুসংস্কার, শিরক, জুলমত ও কুফরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

এই খোশখবর শোনার পর ইমাম রফিউদ্দীন র. পূর্ণ উদ্যমে কেল্লা নির্মাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। আল্লাহ্তায়ালার অফুরন্ত রহমতের ফলে কেল্লা নির্মাণের কাজ আশাতীতভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হইলে সম্রাট ফিরোজশাহ্ ঐ কেল্লার সমস্ত দায়িত্ব হজরত শাহ্ রফিউদ্দীন র. এর উপর অর্পণ করিলেন।

হজরত শাহ্ রফিউদ্দীন র. এর বুজুর্গীর খ্যাতি অতি অল্পদিনের মধ্যে সেরহিন্দে ছড়াইয়া পড়িল। সেখানে তিনি সকলের ইমাম হওয়ার সম্মান লাভ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি পরহেজগারী, তাকওয়া ও মহান আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় লাভের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়া সেরহিন্দ শরীফের সেই অমর প্রতিষ্ঠাতা চিরকালের মত সেরহিন্দের পবিত্র মাটিতে নিজের ঠাঁই করিয়া লইয়াছিলেন। আজও সেখানে তাঁহার পবিত্র মাজার শরীফ অসংখ্য ভক্তদের আকর্ষণ করে।

হজরত ইমাম রফিউদ্দীন র. এর পুত্র এবং প্রপৌত্র ছিলেন যথাক্রমে হজরত শায়েখ হাবিবুল্লাহ্ র. এবং হজরত শায়েখ আব্দুল হাই র.। শায়েখ আব্দুল হাই র. ছিলেন হজরত শায়েখ জয়নুল আবেদীন র. এর পিতা এবং হজরত মখদুম আব্দুল আহাদ র. এর পিতামহ। এই বিখ্যাত বুজুর্গ হজরত আব্দুল আহাদ র. ছিলেন ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী হজরত শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দী র. এর পিতা এবং হজরত মোহাম্মদ মাসুম র. ছিলেন মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর তৃতীয় সাহেবজাদা।

ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. তাঁহার এই পুত্র সম্পর্কে বলিতেন, মোহাম্মদ মাসুমের জন্ম আমার জন্য অত্যন্ত শুভ তাৎপর্যপূর্ণ ও স্থায়ী

সৌভাগ্যের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে। তাঁহার জন্মের মাত্র কয়েকমাস পরেই আমি হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ র. এর সাক্ষাৎ লাভ করি এবং তাঁহার নিকট বায়াত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার খেদমতে সমর্পণ করিবার সুযোগ লাভ করি। হজরত খাজা র. এর নেক নজর, তরবিয়ত ও দোয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি যে দুর্লভ রূহানী দৌলতসমূহ তাঁহার নিকট হইতে হাসিল করিতে কামিয়াব হইয়াছি, তাহার কোন তুলনা হয় না।

হজরত খাজা মাসুম র. বাল্যকালে তাঁহার বড় ভাই হজরত খাজা সাদেক র. এবং হজরত ইমামে রব্বানী র. এর অন্যতম প্রধান খলিফা হজরত শায়েখ মোহাম্মদ তাহের লাহোরী র. এর নিকট হইতে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা লাভ করেন। ইহার পর অধিকাংশ সময় তিনি বুজুর্গ পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দ্বীনি এলেমের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার পিতা হজরত ইমামে রব্বানী র. সব সময় এলেম হাসিল করার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিয়া বলিতেন, এলেমই হইতেছে সমস্ত অবস্থার উৎপত্তি ও উন্নতির মূল, যে জন্য বাতেনী সবকের পূর্বে এলেম হাসিল করা অত্যন্ত জরুরী। হজরত মাসুম র. কে তিনি বলিতেন, এই সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা তুমি তাড়াতাড়ি শেষ কর, কেন না ইহা অপেক্ষা আরও অনেক বড় কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

হজরত মাসুম র. এর শিশুকালেই হজরত মোজাদ্দেদ র. বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি জন্মগতভাবেই বেলায়েতে খাসসায়ে মোহাম্মদীর কাবেল। মাত্র তিন বৎসর বয়সে সমস্ত গুণের সমন্বয়ে হকীকতে তাজাল্লীর সঙ্গে তওহীদের জাতি হরফ যে শিশুর জবানীতে প্রকাশ পায়, সে আর দশজন শিশুর মত কখনও সাধারণ হইতে পারে না। তিনি যে আল্লাহ্তায়ালার খাস রহমত প্রাপ্ত মাহ্বুব এবং ভবিষ্যতে তাঁহার জন্য যে বিরাট দায়িত্বসহ বহু কাজ অপেক্ষা করিয়া আছে তাহা বুঝিতে আল্লাহ্পাকের অনন্ত মারেফতের অধিকারী হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর কোন ভুল হয় নাই।

ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র এগার বৎসর বয়সে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. তাঁহাকে মারেফতের প্রথম সবক প্রদান করেন। যিনি জন্মগ্রহণ করার পর হইতে এই সৌভাগ্য অর্জন করার যোগ্য ছিলেন, জাহেরী এলেম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার সেই প্রকৃত পরিচয় ও সৃষ্টির রহস্যের দিকেও হজরত ইমামে রব্বানী র. তাঁহাকে কিশোর বয়সেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

পিতা হইলেও হজরত ইমামে রব্বানী র. তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও তাজীমের দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি বলিতেন, মাসুম আল্লাহ্তায়ালার মাহ্বুব। জন্মগতভাবেই তিনি পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কোন পাপ কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আল্লাহ্তায়ালার শান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার খাতিরে তাঁহার প্রিয়

মাহ্‌বুবকেও ইজ্জত ও মর্যাদা প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। তাহা না হইলে যে, সেই জাল্লা-জালালুহুর প্রতি অসম্মান করা হয়।

পিতার প্রত্যক্ষ লালন-পালনে এবং আল্লাহ্‌পাকের খাস রহমতে হজরত খাজা মাসুম র. আধ্যাত্মিক অবস্থার বিভিন্ন স্তর ও গুঢ় রহস্যের সঙ্গে একে একে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মাধ্যমে উন্নতির ধাপে ধাপে বিন্যস্ত সোপানসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঊর্ধ্বারোহণের সেই অভিযাত্রায় ১৪ বৎসর বয়সে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার পবিত্র বদন হইতে নূরের ধারা প্রবাহিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া দিতেছে। গভীর অন্ধকার-ভেদী সেই উজ্জ্বল আলোকরশ্মি যেন পার্থিব জগতের সমস্ত অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সবকিছু বিকশিত ও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। একমাত্র প্রখর সূর্যকিরণের সঙ্গেই যেন সেই সর্বত্রগামী নূরের আলোর কিছুটা তুলনা করা যায়। স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পিতা হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কুতুবুজ্জামান (জমানার কুতুব) হইবেন। আমার এই কথা আপনি মনে রাখিবেন।

সেই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য অদৃশ্যলোক হইতে, তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধানে, যেন তাঁহাকে প্রস্তুত করা হইতেছিল– যাহাতে পিতার পর সেই সুকঠিন দায়িত্বসমূহ যোগ্যতা ও সততার সহিত তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করিতে পারেন।

হজরত খাজা মাসুম র. এর স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণজ্ঞানের অধিকারী। কিশোর বয়সে মাত্র তিন মাসের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ কালামপাক হেফজ করিয়াছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. তাঁহার স্মরণ শক্তির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, দিনে দিনে মাসুম আমাদের এই নেসবতের সমস্ত কিছু এমনভাবে সংগ্রহ করিয়া লইতেছে যেমন শরহে বেকায়ার গ্রন্থপ্রণেতা তাঁহার পিতামহের নিকট হইতে তাবৎ ব্যাখ্যা ও ভাষ্য কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন।

অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন হওয়ার গুণে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তিনি কোরআন শরীফ, হাদিস, ফেকাহ্‌ ও ইসলামের অন্যান্য শাখার এলেম শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। তরিকতের পথে তিনি পিতার সযত্ন লালনপালন ও পরিচর্যায় সুলুকের সমস্ত স্তরগুলি একে একে পরিভ্রমণ করেন এবং পারদর্শীতা ও যোগ্যতার সহিত পিতার নিকট ইহতে খেলাফত লাভ করেন। বাতেনী হাল ও সবকের দিকে তিনি নিজেকে এত গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়া রাখিতেন যে, তখন এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর সবকিছুই তাঁহার নিকট বিলীন হইয়া যাইত। আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ রহমতে এইভাবে তিনি তাঁহার বুজুর্গ পিতার সমস্ত হালের হকীকত, মারেফতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যাবলী এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. তাঁহার এই পুত্রের উচ্চ নেস্‌বত ও বাতেনী মাকামাত সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, মাসুম আল্লাহ্‌র আ'রেফ। তিনি আমার নিকট হইতে সামান্য পরিমাণও কিছু ছাড়িতেছেন না। আমি যাহা কিছু বলি, তাহার সমস্তই তিনি ইয়াদ করিয়া লন। তিনি এই মারেফতী কেন্দ্রবিন্দুর একটি স্তম্ভস্বরূপ। আমার নিকট হইতে প্রতিটি আধ্যাত্মিক স্তর তিনি সাফল্যের সহিত শেষ করিয়াছেন। এইভাবে হজরত খাজা মাসুম র. ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর অনন্য কামালাত ও বৈশিষ্ট্যের যাবতীয় অংশ হাসিল করিয়াছিলেন। পিতার এই সমস্ত গুণসমূহের অধিকারী হওয়ার জন্যই খাজা মাসুম র. সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, মাসুম আমার পরে আমারই মত দুনিয়ার কুতুব হইবেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভকারী এই মাহবুব সম্পর্কে হজরত ইমামে রব্বানী র. একদা বর্ণনা করিয়াছেন, মাসুমকে আল্লাহ্‌পাক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ করিয়াছেন। রাব্বুল আ'লামীন তাঁহার হাবীব হজরত আহম্মদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর পবিত্র দেহ মোবারক যে মোবারক মাটি দ্বারা তৈরী করিয়াছিলেন, তাহার অবশিষ্টাংশের কিয়ৎ পরিমাণ মাসুমের দেহেও মিশিয়া আছে যাহার ফলে তিনি জন্মগতভাবে পবিত্রতার অধিকারী এবং যাহার প্রভাবে তিনি মূলতত্ত্বের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া কাইয়ুমিয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। খাজা মাসুম র. সম্পর্কে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, মোহাম্মদ মাসুম সাবেকীন্‌ অর্থাৎ অগ্রগামীদের দলভুক্ত। সাবেকীন ও আখেরীনদের শানে কালাম-পাকে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, সুল্লাতুম্‌ মিনাল্‌ আওয়ালীনা ওয়া কালীলুম্‌ মিনাল্‌ আখেরীন অর্থাৎ সাবেকীনদের মধ্যে এক জাতি এবং আখেরীনদের মধ্যে অল্প সংখ্যক।

হজরত শায়েখ আহমদ র. তাঁহার পুত্র মাসুমকে শুধু স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন না, আল্লাহ্‌র মাহবুব হিসাবে তাঁহাকে তাজিম ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিশোর বয়সে একবার মাসুম র. তাঁহার পিতার সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন। একদিন দুপুরে পিতা ঘরে না থাকায় তিনি তাঁহার পিতার পালংকে ঘুমাইয়া পড়েন। ইত্যবসরে হজরত মোজাদ্দেদ র. ঘরে ফিরিয়া আসিলে খাদেমগণ শশব্যস্ত হইয়া নিদ্রিত মাসুম র.কে জাগাইতে উদ্যত হইলেন। হজরত মোজাদ্দেদ র. নিষেধ করিয়া তাজিমের সহিত বলিলেন, ওখানে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় মাহবুব আরাম করিতেছেন। ঘুম হইতে তাঁহাকে জাগাইলে তাঁহার আরামের ব্যাঘাত ঘটিবে এবং তিনি কষ্ট পাইবেন। এই কথা বলার পর হজরত মাসুম র. ঘুম হইতে জাগিয়া না উঠা পর্যন্ত তিনি ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায়, হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহার পিতা এবং অত বড় বুজুর্গ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালার পছন্দ ও ভালবাসার কারণে নিজ পুত্র কিশোর মাসুমের প্রতি তিনি কতখানি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইসলাম ধর্মের সহিত শত্রুতা করার মানসে দিল্লীর বাদশাহ্ আকবর যে 'দ্বীন-ই-ইলাহি' নামক এক কিম্ভূতকিমাকার নূতন ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করিতে গিয়া হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. রাজরোষে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহ্ আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সাহসী না হইলেও আকবরের পরে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ঘনিষ্ঠ মহলের উস্কানিতে চক্রান্তের শিকার হন এবং শাহি দরবারে প্রবেশ করিবার সময় কুর্নিশ না করার অজুহাতে তিনি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র.কে গোয়ালিয়র জেলে প্রেরণ করেন। বাদশাহের এই হঠকারিতায় মোজাদ্দেদিয়া অনুসারী অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সহিত প্রধান সেনাপতিসহ অধিকাংশ সেনাবাহিনী অসন্তুষ্ট হইলে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর সেনাবাহিনীর ঐ সমস্ত লোকদের দমন করিতে গিয়া প্রধান সেনাপতির নিকট পরাস্ত ও বন্দী হন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফেতনা-ফাসাদ অবিলম্বে বন্ধ করিয়া পূর্বের মত বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য জেলখানা হইতে প্রধান সেনাপতির নিকট নির্দেশ প্রেরণ করেন।

যেমন মোর্শেদ, তাঁহার তেমনি মুরিদ। বিনা বাক্যব্যয়ে প্রধান সেনাপতি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া পূর্বের মত বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলেন এবং সম্মানের সহিত তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বাদশাহ্ আবার তাঁহার বাদশাহী ফিরিয়া পাইলেন। এই ঘটনায় বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর আশ্চর্য ও হতবাক হইয়া গেলেন। হাতে পাইয়াও হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন না। কি আশ্চর্য মহানুভবতা! হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর এই অভূতপূর্ব মহানুভবতার ফলে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের জীবনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হইল। তিনি হজরত মোজাদ্দেদ র.কে শুধু জেল হইতে সসম্মানে মুক্তিই প্রদান করিলেন না, হজরতের সমস্ত শর্তগুলিকে আদেশ হিসাবে মানিয়া লইয়া দ্বীন-ই-ইলাহির যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও শরিয়ত-পরিপন্থী সকল প্রকার বেদাতী কার্যকলাপসমূহ অবিলম্বে বন্ধ করিবার জন্যও নির্দেশ প্রদান করিলেন এবং সেইসঙ্গে অনুতপ্ত চিত্তে হজরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট বায়াত গ্রহণ করিলেন।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহান যখন দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহ্জাহানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া বৃদ্ধ বাদশাহ্কে শাহ্জাহানের প্রতি বিরূপ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন করিয়া তোলেন, তখন একসময় বাধ্য হইয়া শাহ্জাহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে নিজস্ব শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রায় পরাজয়ের মুখে বাদশাহ্ উপায়ান্তর না দেখিয়া হজরত মোজাদ্দেদ র. এর নিকট হাজির হইয়া বিজয়ের জন্য দোয়া প্রার্থনা করিলেন। হজরত মোজাদ্দেদ

র. তাঁহার জন্য দোয়া করিলে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর পুত্রের বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর শাহ্জাহান ইহা জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ন হৃদয়ে হজরতের নিকট হাজির হইয়া আরজ করেন, অপরিণামদর্শী পিতা অপেক্ষা তিনি তাঁহার অধিক ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও হজরত কেন তাঁহার জন্য দোয়া করেন নাই। উত্তরে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. স্মিত হাস্যে তাঁহাকে শান্ত হওয়ার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, বাবা একটু সবর কর। বৃদ্ধ পিতাকে কষ্ট দিও না। অদূর ভবিষ্যতে তুমি তোমার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিবে আর আমার পুত্র মোহাম্মদ মাসুম আমার সমগ্র বাতেনী মসনদে অধিষ্ঠিত হইবে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. বয়সের শেষ প্রান্তে কোন মজলিশে বা দরবারে আসা যাওয়া প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বাহিরের লোকজনের সঙ্গে তেমন দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। তাঁহার শেষ জীবনের এই দিনগুলিতে তিনি আল্লাহ্র অন্তহীন প্রেমে অধিকাংশ সময় মশগুল হইয়া থাকিতেন। তাঁহার সমস্ত মুরিদগণের ভার এবং অন্যান্য কাজের দায়িত্ব তিনি তখন খাজা মাসুম র. এর উপর সোপর্দ করিয়া দিয়াছিলেন। তখন হইতে মসজিদের ইমামতী, মুরিদগণের তরবিয়ত এবং লোকজনকে তরিকায় বায়াত করার সমস্ত দায়িত্ব হজরত মাসুমকে পালন করিতে হইত।

এমনি সময়ে একদিন হজরত মাসুমকে নিভৃতে নিজের কাছে ডাকিয়া হজরত মোজাদ্দেদ র. বলিলেন, এই নশ্বর দুনিয়ায় আমার বাঁচিয়া থাকার আর কোন প্রয়োজন আমি দেখিতেছি না। আমাকে কাইয়ুমিয়াতের যে মহান মর্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছিল, উহার অধিকারী এখন আপনি। আপনার প্রতি মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির কারণে, আমার জীবিতকালে, উহা আপনি লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত এই বিরল নেয়ামতের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং শোকরগোজার থাকিবেন। যাবতীয় সৃষ্টি পূর্ণ শওকের সহিত এখন হইতে আপনার দিকে ধাবিত হইতেছে, কারণ তাহারা সকলেই আপনার কাইয়ুমিয়াতে উপর খুব সন্তুষ্ট।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে ১০৩৪ হিজরীর ২৮শে সফর (১৬২৪ ইং) ৬৩ বৎসর বয়সে হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. ইন্তেকাল করিলে হজরত খাজা মাসুম র. পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। দ্বীন ইসলামের সঠিক ধারাকে নানাবিধ ভ্রষ্টতা, বেদাতী ও কলুষতা হইতে সংস্কার সাধনের পর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জীবনাবসান ঘটে। দিল্লীর বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তখন তাঁহার অনুগত ভক্ত ও অন্যতম প্রধান মুরিদ। বাদশাহ্ আকবরের 'দ্বীন-ই-ইলাহি'র নূতন মতবাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। বিশিষ্ট আমীর ওমরাহ, আলেম হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মানুষ এমন কি সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী পর্যন্ত

সমগ্র হিন্দুস্তান জুড়িয়া তখন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর কাফেলায় শরীক হইয়াছেন। হিন্দুস্তানের বাহিরেও তখন কিছু কিছু মুরিদান ও খলিফা ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। বে-দ্বীনের অন্ধকার হইতে দ্বীনের মশালকে সাহাবায়ে কেরামগণের নূরের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন হজরত ইমামে রব্বানী। এখন সেই আলোর শিখাকে ক্রমান্বয়ে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও দীপ্ত করার দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে হজরত মাসুমের উপর। সেই বিশাল কাজের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও প্রজ্ঞার সহিত হজরত খাজা মাসুম র. পালন করিয়া চলিলেন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানে এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিলেন। উপদেশ প্রদান এবং হেদায়েতের পথে আহবান করা ছাড়াও শরীয়ত সম্পর্কে শিক্ষাদান ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়সমূহে বক্তৃতা প্রদান করা তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় ছিল। তিনি তফসির, হাদিস, ফেকাহ্ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ অত্যন্ত যত্নের সহিত সকলকে শিক্ষা প্রদান করিতেন।

মোঘল সাম্রাজ্যের বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর, বাদশাহ্ শাহ্জাহান ও বাদশাহ্ আলমগীর র. হজরত খাজা মাসুম র. এর মুরিদ ছিলেন। এই তিনজন বাদশাহ্ প্রত্যেকেই তাঁহাদের রাজত্বকালে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র.কে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবদ্দশায় সেরহিন্দ শরীফে তশরীফ লইয়া আসিয়াছিলেন। বিশেষভাবে বাদশাহ্ আলমগীর র. তাঁহার বিশিষ্ট মুরিদ এবং তাঁহার ভাইদের অতি ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। মকতুবাতে মাসুমীয়ার মধ্যে (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে) দেখা যায়, কয়েকটি মকতুব বাদশাহ্ আলমগীর র. এর নামে লিখিত হইয়াছে– যাহা হইতে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর সহিত বাদশাহ আলমগীর র. এর আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বিষয়ে ভালভাবে অবহিত হওয়া যায়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. কাদেরিয়া, চিশতিয়া, সোহ্রাওয়ার্দিয়া প্রভৃতি তরিকার খলিফা ছিলেন। তিনি সর্বশেষ খেলাফত লাভ করেন হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ র. এর নিকট হইতে নকশ্বন্দিয়া তরিকায়। এই নকশ্বন্দিয়া তরিকার মূল্যবান সিল্সিলা ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে হজরত ইমামে রব্বানী তাঁহার বহু মকতুবাত ও পুস্তিকায় অনেক খোশখবর ও প্রশংসাবাণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নকশ্বন্দিয়া তরিকা ছাড়াও অন্যান্য তরিকার সারবস্তুকে তিনি আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধনের সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মোজাদ্দেদ সুলভ প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম জ্ঞানের আলোকে যে পূর্ণ সৌন্দর্যমণ্ডিত নতুন তরিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. ছিলেন সেই তরিকারই প্রধান ধারক এবং প্রচারক। এই তরিকাই খাস্ মোজাদ্দেদিয়া তরিকা হিসাবে অভিহিত হইয়া থাকে। হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর আন্তরিক

প্রচেষ্টার ফলে এই তরিকার মাধ্যমে ইসলামের লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য প্রজ্জ্বলিত সূর্যের মতো সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিকশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. যে কতবড় আল্লাহ্‌ভক্ত সাধক, ধর্ম সংস্কারক, মারেফতের উচ্চস্থানে আসীন ও আল্লাহ্‌তায়ালার মাহ্বুব ছিলেন, তাহা ধারণা করাও যেমন আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, তেমনি হজরত খাজা মাসুম র. সম্পর্কেও সাধারণভাবে ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে, হজরত খাজা মাসুম র. ছিলেন পিতার সর্বপ্রকার মারেফতসমূহের প্রকৃত সমঝদার ও রাজদার। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর বহু অপ্রকাশিত গোপন রহস্য এবং মারেফতের ধারণাতীত রকমের উচ্চ এবং সূক্ষ্ম মাকামাত ও বিষয়গুলি সম্পর্কে অন্য কেহ অবহিত ছিলেন না। হজরত মোজাদ্দেদ র. লিখিত কোন কোন দুর্লভ মকতুব হইতে জানা যায়– আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানীকে এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মারেফতের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু ও হকিকত সম্পর্কে জ্ঞানদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র এক তৃতীয়াংশ সাধারণের অবগতির জন্য, এক তৃতীয়াংশ বিশিষ্ট খলিফাগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ ছিল অত্যন্ত গোপনীয়তার সহিত সুরক্ষিত। কিন্তু হজরত খাজা মাসুম র. পিতার সমস্ত প্রকার মারেফতেরই পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। পিতার যে সমস্ত মকতুব, পুস্তিকা ও মারেফতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণের জ্ঞানের স্তর ছিল অত্যন্ত সীমিত, তিনি সেইগুলিকে আরও সহজভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া সকলের জন্য বোধগম্য করিয়া তুলেন এবং সারাজীবন অত্যন্ত যত্নের সহিত মারেফত সংক্রান্ত এইসব দুরূহ ও জটিল বিষয়গুলির সহজতম ও বোধগম্য ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

হজরত খাজা মাসুম র. মক্কা ও মদীনাশরীফ সফর করিয়া হজ্ব ও জিয়ারতের মাধ্যমে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। হজ্ব ও জিয়ারতের সময়ে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ এবং দুই জাহানের সরদার জনাব রসুলে মকবুল স. এর নিকট হইতে অশেষ মেহেরবানি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হজরত খাজা আবদুল্লাহ র. কর্তৃক লিখিত তথ্যাদি হইতে এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে অনেক কিছু জানা যায়, যাহার কিছু কিছু সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হইল।

সমুদ্র সফর শেষে স্থলপথে রওয়ানা হওয়ার পর হজরত মাসুম র. জানান যে, এখানকার পাহাড় পর্বত মরুভূমি সবকিছুই নবী করিম স. এর নূরে ভরপুর হইয়া আছে। খানায়ে-কাবা আজ নিজ মাকাম শরীফ হইতে আমার নিকট তশরিফ লইয়া আসিয়াছেন।

এই রকম সম্মান ও সৌভাগ্য এই দুনিয়াতে আর কয়জনের ভাগ্যে জুটিয়াছে তাহা এক আলেমুল গায়েবই জানেন। মক্কামোয়াজ্জামায় অবস্থানকালে হজরত মাসুম র. আল্লাহ্তায়ালার প্রেমে এতই বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, অধিকাংশ সময় তিনি খানায়ে কাবার তওয়াফে মশগুল হইয়া থাকিতেন এবং এই ইবাদতকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত বলিয়া মনে করিতেন।

মিলনের স্থান ছিল বড়ই মনোরম এবং প্রেমের সেই মিলনও ছিল খাঁটি ইশকের রঙে রঞ্জিত। জীবনের সেই দিনগুলিই ছিল তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও আনন্দময়। সেই মিলনঘন মুহূর্তে একদিন হজরত বলিলেন, কাবা শরীফের অনন্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে আমি এখন আলিঙ্গনাবদ্ধ এবং চুম্বনরত। যাবতীয় সৃষ্টি এখন নূরের আলোকে উল্লসিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং আমার সমগ্র সত্তা এখন কাবায়ে-হাসানার অবিচ্ছিন্ন সত্তার সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে।

অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতায় আল্লাহ্তায়ালা নিজ হইতে এইভাবে তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তাঁহাকে মিলনমাল্যে ভূষিত করেন। মক্কা শরীফ হইতে বিদায় গ্রহণ করার সময় ঘনাইয়া আসিলে হজরত বলিলেন, এখান হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যে দুর্লভ পুরস্কার প্রদান করেন এবং উচ্চ মর্যাদায় পরিপূর্ণ দানসমূহ এনায়েত করেন তাহা বর্ণনাতীত। ইতিপূর্বে অবুদীয়তের খেলায়াতে সৌভাগ্যশালী করা ছাড়াও বিদায়ী খেলায়াত হিসাবে আমাকে বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ কারুকার্যখচিত একটি অতিমূল্যবান উজ্জ্বল সবুজ রঙের জড়োয়ার চাদর উপহার স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে। ইহার পরে আমার সঙ্গীদের সকলের প্রতি পৃথক পৃথকভাবে খেয়াল করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্তায়ালার প্রেমের কী অপার মহিমা! পবিত্র এক আশেকের অসিলায় তাঁহার সঙ্গীগণকেও আল্লাহ্তায়ালা এইভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

হজরত খাজা মাসুম র. হজরত নবী করিম স. এর রওজা মোবারক এবং খলিফাবৃন্দ, আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরামগণের মাজার শরীফ জিয়ারত করিয়া বিশেষ বিশেষ ধরনের খাস্ ফয়েজ ও বরকতসমূহ লাভ করেন। জনাবে রসুলুল্লাহ স. এর রওজা মোবারক ছাড়াও তিনি হজরত আবুবকর রা, হজরত ওমর ফারুক রা, হজরত ওসমান রা, হজরত খাদিজাতুল কোবরা রা, হজরত ফাতেমা জহুরা রা, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-গণের রওজা শরীফ পৃথক পৃথকভাবে জিয়ারত করেন এবং সকলের ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও তেজদীপ্ত নেসবতের আবির্ভাব হইতে অসীম অনুগ্রহ, দয়া, স্নেহ মমতা, প্রগাঢ় ভালবাসা, খেলায়াত, খুবি ও বিশেষ বিশেষ হালাতের উপর রহস্যের অন্তরাল হইতে মারেফতের বহু উচ্চ মাকামে অবস্থিত মোয়ামেলা ও নেয়ামতসমূহ লাভ করেন। ইহা ছাড়া জান্নাতুল বাকী এবং অন্যান্য মোবারক মাজারসমূহ জিয়ারত করিয়া ফয়েজ ও বরকতের নূরের মধ্যে অবগাহন করেন।

হজরত খাজা মাসুম র.কে মসজিদে নববীতে দুইদিনের জন্য এতেক্বাফের এজাজত দেওয়া হইয়াছিল। হজরত বলেন, রাত্রে মোরাকাবারত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, হজরত নবীয়ে করিম স. তাঁহার খুশী ও মেহেরবানি প্রকাশ করিলেন। আরও গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সময় অনুভব করিলাম, আমাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। সেই সময় আমি রসুলেপাক স. এর হকীকতের বিশেষ নৈকট্য লাভ করিয়াছিলাম।

হজরত মাসুম র. বলেন, জান্নাতুল বাকীর যে যে কবর জিয়ারতের জন্য গিয়াছি, সেই সব কবরের বাসিন্দাগণ অত্যন্ত খুশী ও খুবির সহিত আমার নিকট নিজদিগকে জাহির করিতেন। অন্যদিকে যে কবর জিয়ারত করিবার জন্য এরাদা করিতাম, সেই কবরবাসী আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেন এবং সেখানে যাওয়ার পর, বিশেষ মেহমান হিসাবে, আমার সহিত তাঁহারা মোলাকাত করিবার জন্য সমবেত হইতেন।

খাজা মাসুম র. বলেন, পবিত্র জান্নাতুলবাকী ও অন্যান্য মোবারক মাজারসমূহ জিয়ারতের সময় সেখানে আমার নেসবতের প্রভাব আশ্চর্যজনকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। মনে হইত, সমস্ত পৃথিবী যেন সেই নেসবতের নূরের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি স্পষ্টভাবে অনুভব করিতাম, দৃশ্য ও অদৃশ্য দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি আমার মুখাপেক্ষী এবং আমি তাহাদের সকলের ইমাম। আমার অসিলাতেই সকলের নিকট ফয়েজ ও বরকতসমূহ পৌঁছাইত। আমার নিকট সে সময় বহু রহস্যপূর্ণ গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছিল এবং অনেক কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য আমার নিকট দোয়াত কলম আসিয়া হাজির হইতেছিল। আমার নেসবতকে প্রবলভাবে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম রেজওয়ানল্লাহু আলায়হীম্ আজমাইন্গণের উচ্চ মর্তবার নিকট আমার মত ফকিরের দীন নেসবত কিভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। পরে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমার এই অবস্থা তাঁহাদেরই নেক নজর ও অনুগ্রহের দানে ভরপুর ছিল।

মদীনা মনোয়ারায় অবস্থানকালে হজরত মাসুম র. একদিন বলিলেন, বর্তমানে আমার নিজের নেসবত আমি পরিপূর্ণভাবে সরওয়ারে-আলম সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি পাইতেছি। ইহার মধ্যে এমন অনেক গোপন রহস্য ও বিষয়সমূহ আছে যাহা চক্ষু কোনদিন দর্শন করে নাই এবং কর্ণ শ্রবণ করেন নাই। তাহার মধ্যে অনেক কিছুই প্রকাশ করা যায় না। তবে এই সমস্ত গোপন রহস্য ও হালাতের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে পুসিদা রাখা ছাড়াও তাহার মধ্যে

কিছু কিছু প্রকাশযোগ্যও বটে, যাহার ইশারা-ইঙ্গিতই কোন কোন মাকামের জন্য যথেষ্ট। মাকামাতের এই সকল অন্তর্নিহিত অবস্থা ও রহস্যভেদী পরিচিতির সঙ্গে ফানা ও বাকার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইতে উহা বহু বহু গুণে শ্রেষ্ঠ।

মদীনা শরীফ হইতে বিদায়ের দিনের কথা স্মরণ করিয়া হজরত খাজা র. জানান, সেইদিন বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে মসজিদে গিয়া হাজির হইলাম। বিচ্ছেদের ব্যথায় পেরেশান হইয়া বেহুঁশের মত আমি কাঁদিতেছিলাম। আমার সেই দুঃখ ও পেরেশানীর মধ্যে দেখিলাম, হজরত রেসালতে-খাতেমিয়াত স. পূর্ণ আজমতের সহিত রওজা শরীফ হইতে জাহের হইয়া তশরীফ আনিলেন এবং অত্যন্ত মেহেরবানির সঙ্গে অতি উচ্চ মর্যাদাবাহী একটি বাদশাহী তাজের খেলায়াত স্বহস্তে আমাকে পরাইয়া দিলেন। চোখ জুড়ানো পালক ও দুর্লভ মতির সমন্বয়ে প্রস্তুত এই খেলায়াত আঁ-হজরত স. নিজের পবিত্র দেহ মোবারক হইতে খুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমার নিকট অনুভূত হইল। এই সময় আমার মনের অবস্থা এমন হইল যে, এখান হইতে আর কোনদিন আমি ফিরিয়া যাইব না বলিয়া মনে করিলাম এবং তৎসম্পর্কে রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের মরজি মোবারক জানিবার জন্য অত্যন্ত আদবের সহিত তাঁহার প্রতি আমি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে খেয়াল করিলাম। রসুলেপাক স. আমার স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার পক্ষে মত দিলেন বলিয়া আমি অনুভব করিলাম।

সেই সময়ে হঠাৎ শরীয়তের এক দুশমনের কথা আমার মনের মধ্যে উদয় হইল এবং তাহার সম্পর্কে কিছু নির্দেশ লাভ করার মানসে নবী করিম স. এর প্রতি পুনরায় মোতাওয়াজ্জোহ্ (পূর্ণ মনোযোগী) হইলাম। আমার মনে হইল, রসুলে আকদাস্ স. তাঁহার মোবারক হাতে খোলা তরবারি লইয়া আবির্ভূত হইলেন এবং কতলের ইশারা করিলেন।

হজরত খাজা মাসুম র. সেই সময়ে বাদশাহ্ শাহ্ জাহানের পুত্র দারাশিকোর কথা মনে করিয়াছিলেন, যিনি ইসলামের প্রতি ও তাঁহার খানদানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। হজরত মাসুম র. হজ্বে যাওয়ার পর দারাশিকো প্রতারণা করিয়া দিল্লীর বাদশাহী লাভ করেন। জানা যায়, রসুলেপাক স. যে সময় কতলের জন্য ইশারা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তলোয়ারের আঘাতে দারাশিকো নিহত হন।

হজরত খাজা মাসুম র. হজ্ব হইতে সেরহিন্দে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের ও তরিকার খেদমতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র সহবতের প্রভাবে হাজার হাজার মুরিদান আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে শায়েখ মুরাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল কাজানি

জিল বিশ্‌হাতে লিখিয়াছেন, খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. ছিলেন, আয়াতাম্‌মিন আয়াতুল্লাহ্‌ অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। তাঁহার পিতার মতোই তিনি সমস্ত দুনিয়াকে আলোকিত করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে প্রাপ্ত উচ্চ মর্যাদার বরকতে পিতার পরে ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত অনাচার, অজ্ঞতা ও বেদাতের অন্ধকারকে তিনি নির্মূল করিয়াছিলেন।

লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ছাড়াও বড় বড় আলেম, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞসহ অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁহার মুরিদ ছিলেন। শরীয়ত ও তর্ক শাস্ত্রের প্রখ্যাত আলেম ও লেখক জমির জাহেদ তাঁহার মুরিদ ছিলেন এবং সাহেবে রওজাতুল কাইয়ুমিয়া তাঁহার খলিফা ছিলেন। ফারসীর বিখ্যাত কবি নাসির আলী সেরহিন্দী তাঁহার মুরিদ ছিলেন। নাসির আলীর কাব্যের প্রতি অনুরাগ থাকিলেও প্রথম জীবনে তাঁহার কোন কাব্য প্রতিভা ছিল না। হজরত খাজা মাসুম র. এর নিকট তিনি তাঁহার আরজু সম্পর্কে আরজ করিলে হজরত নিজের অজুর পানি হইতে তাঁহাকে সামান্য পরিমাণ পান করিতে দেন ও তাঁহার জন্য দোয়া করেন। তখন হইতে নাসির আলীর অন্তরে কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফারসী কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। নিজ মোর্শেদের সম্মানে কবি নাসির আলী সেরহিন্দী এই কবিতা লিখিয়াছিলেন ঃ-

লক্ষ যোজন জুড়ে নিত্য যে সপ্তসভার আয়োজন
তার প্রদীপ স্বরূপ খাজা মাসুম,
অন্ধকার বিনাশ ক'রে সে আলোয় উদ্ভাসিত
কাছের হিন্দুস্তান কিংবা দূরের রোম।

বাদশাহ্‌ জাহাঙ্গীর, বাদশাহ্‌ শাহ্‌জাহান ও বাদশাহ্‌ আলমগীরের (আওরঙ্গজেবের) রাজত্বকালে বড় বড় আমীর উমরাহ্‌ এবং উচ্চপদস্থ বহু রাজ কর্মচারী তাঁহার মুরিদান ও ভক্ত ছিলেন।

বাদশাহ্‌ আলমগীরের রাজত্বকালে লাহোরের গভর্নর নবাব মোকাররম খান তাঁহার মুরিদ ও অনুসারী ছিলেন। তিনি রাজমর্যাদা ও উচ্চপদের মোহ পরিত্যাগ করিয়া মোর্শেদের সহবত ও খেদমতের জন্য সেরহিন্দে চলিয়া আসেন। বাদশাহ্‌ আলমগীর একবার নবাব মোকাররম খানকে তাঁহার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে নবাব সাহেব তাঁহার বয়স চার বৎসর বলিয়া জবাব দিয়াছিলেন। জবাব শুনিয়া বাদশাহ্‌ আলমগীর মৃদু হাসিয়াছিলেন। নবাব মোকাররম তখন বাদশাহ্‌কে বলিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু নাই; কারণ যে চার বৎসর ধরিয়া আমি মোর্শেদের খেদমতে নিয়োজিত আছি, সেই চার বৎসরই আমার প্রকৃত বয়স। জীবনের বাকী দিনগুলি তো আখেরাতের জন্য বোঝা ও শাস্তিস্বরূপ।

তৎকালীন বহু বিখ্যাত বুজুর্গ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব খানকায়ে মাসুমীয়া হইতে তরিকার শিক্ষা এবং ফয়েজ বরকত লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পিতার গুপ্ত মারেফতের রহস্যসমূহ এবং মারেফতের অতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর রচনায় ও মকতুবসমূহে যে সমস্ত মারেফত সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই, সেইগুলি অতি যত্নের সহিত তাঁহার নিকট সুরক্ষিত ছিল।

হিন্দুস্তানের বিখ্যাত পণ্ডিত এবং শরীয়ত ও তরিকতের বিখ্যাত বুজর্গ হজরত মিরজা জানেজাঁনা র. এর সহিত তাঁহার রূহানী সম্পর্ক ছিল পরবর্তী দুই পুরুষের ব্যবধানে। কেবলাত্র মিরজা শহীদ র. এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ মোজাদ্দেদিয়া তরিকা হইতে ফয়েজ বরকত লাভ করিয়া সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন। মিরজা শহীদ র. এর উত্তরাধিকারী এবং পরবর্তীকালে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণের দ্বারা তরিকার ও দ্বীনের যে বিশাল বাগান আবাদ হইয়াছিল ও বহু দূরদূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার হিসাব কেহ দিতে পারিবে না।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার মনোনীত দ্বীন ইসলামের তরিকতে এবং মারেফতে হজরত খাজা মাসুম র.কে যে খাস্ পূর্ণতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিমাপে অনুমান করাও সম্ভব নয়।

তাসাররূফাত বা কারামত প্রদর্শন করা যদিও কোন কামেল বুজুর্গের উদ্দেশ্য নয়, তবু অনেক ক্ষেত্রে জীবনের বহু কার্য ও ঘটনাবলীর মাধ্যমে তাহার কিছু কিছু কোন কোন বিশেষ সময়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে, যাহার মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটিয়া থাকে। হজরত খাজা মাসুম র. এর জীবনেও এই ধরনের বহু ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহার মধ্যে এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হইল।

হজরত খাজা মাসুম র. হজ্বের সফরে বাহির হইয়াছেন। এমন সময় শাহ্জাদা আলমগীর (পরবর্তীকালে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব) তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া অত্যন্ত আদবের সহিত হজরতের কদমবুসি করিলেন এবং পথিমধ্যে সফর সঙ্গীগণসহ তাঁহার খরচের জন্য বিনয় ও সম্মান সহকারে হজরতের নিকট বারো হাজার টাকা নজরানাস্বরূপ পেশ করিলেন। হজরত খাজা মাসুম র. শাহজাদার বিনয় ও নম্রতায় খুব খুশী হইয়া তাঁহাকে সুসংবাদ দান করিলেন। শাহ্জাদা তাহা লিখিয়া দিবার জন্য আরজ করিলে হজরত স্বহস্তে তাহা লিখিয়া দিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় ঐ সুসংবাদ অনুযায়ী শাহ্জাদা আলমগীর দিল্লীর বাদশাহী লাভ করিয়াছিলেন।

হজ্বের সফরে মদীনা শরীফ হইতে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে হজরত মাসুম র. বিপথগামী ও শত্রুভাবাপন্ন শাহ্জাদা দারাশিকো (শাহ্জাদা আলমগীরের বড় ভাই)

এর ব্যাপারে হজরত রসুলে করিম স.কে অসিলা গ্রহণ করায় নবী করিম স. এর ইশারা অনুযায়ী দারাশিকো নিহত হইয়াছিলেন এবং শাহ্‌জাদা আলমগীরের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রধান বাধা অপসারিত হইয়াছিল।

মক্কাশরীফে অবস্থানকালে হজরত তাঁহার বড় ভাই খাজা মোহাম্মদ সাঈদ র. এর অসুখের খবর জানিতে পারেন এবং তাঁহার সুস্থতার জন্য তিনি দোয়া করিলে খাজা সাঈদ র. সুস্থ হইয়া উঠেন। পরে হজরত বলিয়াছিলেন, আমি যখন আমার বড় ভাইয়ের সুস্থতা প্রার্থনা করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে হাত উঠাইয়াছিলাম, তখন আমার সহিত সমগ্র মাখলুকও দোয়ায় শরীক হইয়াছিল।

মারেফত হাসিলের প্রথম দিকে হৃদয় যেন ভাবাবেগে সমুদ্রের মত উন্মাতাল হইয়া উঠে। কামালত লাভের পর সে হৃদয় ধীরে ধীরে প্রশান্ত হইতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছার সহিত ক্রমশঃ একীভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু হঠাৎ কোন কোন সময় কোন শেরেকি কিংবা বেদাতী কার্যকলাপ দেখিলে সেই প্রশান্ত হৃদয়ও জোশে গর্জন করিয়া উঠে, আল্লাহ্‌পাকের শানে সেই কুফরী ও ভণ্ডামীর তখন পরিসমাপ্তি ঘটে।

হজরত খাজা মাসুম র. এর জামানায় এক সন্ন্যাসী তাহার যাদুর প্রভাবে আগুনের দাহিকা শক্তিকে নিবারণ করিয়া তাহার সেই যাদু দ্বারা সে লোকজনকে আকৃষ্ট করিত। একদিন এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া হজরতের অন্তরে ও বাহিরে প্রবল গয়রতের সৃষ্টি হইল। তিনি তাঁহার মুরিদগণকে তখনি এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে লেলিহান সেই অগ্নিশিখার দিকে ফুঁক দিয়া তিনি কালাম পাক হইতে আয়াত শরীফ পাঠ করিলেন এবং আগুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আগুন, তুমি ইবরাহীম আ. এর মত আরামদায়ক শীতল হইয়া যাও। ইহার পর এক ব্যক্তিকে সেই অগ্নিকুণ্ডে বসিয়া জিকির করার জন্য আদেশ করিলেন। উক্ত ব্যক্তি আদেশ অনুযায়ী নির্দ্বিধায় সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিকিরে রত হইলেন। পরে দেখা গিয়াছিল, সেই অগ্নিকুণ্ড তাঁহার জন্য ফুলের বাগানের মত আরামদায়ক স্থানে পরিণত হইয়াছিল। আল্লাহ্‌পাকের পাক কালামে বর্ণিত হাজার হাজার বৎসর পূর্বের এক নিদর্শন তাঁহার ইচ্ছায় এই ভাবে হজরত মাসুম র. এর অসিলায় হিন্দুস্তানে আবার জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

হজরতের খাদেম ও মুরিদ জনৈক হেকিম সাহেব কোন এক আমীরের চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু হেকিম সাহেবের ঔষধে সেই আমীরের অসুখ উপশম হওয়ার পরিবর্তে আরও বাড়িতে থাকিলে আমীর তাঁহার প্রতি রুষ্ট ও রাগান্বিত হইয়া পড়িলেন। ইহার ফলে হেকিম সাহেব ভীত হইয়া হজরতের

খেদমতে আসিয়া সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে সবিশেষ আরজ করিয়া নির্দেশের অপেক্ষায় হজরতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হজরত মাসুম র. হেকিমের মনের উদ্বেগ বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি পূর্বে হেকিম ছিলেন না, তবে এখন হইতে তাহা হইয়া গেলেন। আপনার অসুস্থ আমীরকে অমুক অমুক ঔষধ দুইটি সেবন করিতে দিন, ইনশাল্লাহ্ তিনি অচিরেই সুস্থ হইয়া উঠিবেন। হজরতের নির্দেশ মোতাবেক হেকিম সাহেব সেই ঔষধ দুইটি আমীরকে সেবন করাইলে আমীরের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল এবং অচিরেই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

হজরত খাজা মাসুম র. এর দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন সময়ে ও বহু ঘটনাবলীতে অসংখ্য তাসাররূফাত বা কারামতসমূহ ছড়াইয়া আছে। কিন্তু এই অল্প পরিসরে বিধৃত তাঁহার জীবনকাহিনীতে সেই সমস্ত কারামতের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করা আসল উদ্দেশ্য নয়।

হজরত খাজা মাসুম র. খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, একনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না এবং কাহাকেও ভয় করিতেন না। একমাত্র মা'বুদ আল্লাহ্তায়ালার ভয়ে তিনি সব সময় ভীত থাকিতেন। তিনি প্রায় বলিতেন, জীবনের উত্তম অংশ কামনাবাসনায় অতিবাহিত হইয়াছে। শেষ বয়সের এই নিষ্কর্মা জীবন তো বোঝাস্বরূপ। এই বয়সের আমল ও ইবাদতের উপর আর কতটুকু নির্ভর করা যায়। অজ্ঞতার কারণে এখন লজ্জায় ও ভয়ে মরিয়া যাইতেছি। সামনে অনন্তকালের সফর, কিন্তু সেই সফরের জন্য কোন সামান আমি এখনও পর্যন্ত গোছগাছ করিতে পারি নাই।

হজরত খাজা মাসুম র. এক অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মুরিদদের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন থাকিতেন। তাঁহার প্রভাবে সকলেই প্রভাবান্বিত হইতেন। মুরিদানগণের ধর্মীয় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁহার সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। সকলের সঙ্গে তাঁহার এক অবিচ্ছেদ্য ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় লাভ করার আশায় আশাধারী খাঁটি মুরিদগণের ফানা ও বাকা, তাঁহার পবিত্র সহবত ও তরবিয়তের ফলে, এক সপ্তাহের মধ্যে হাসিল হইত এবং একমাসের মধ্যে সেই সব তালেবে মওলা বেলায়েতের মাকামে পূর্ণতা লাভ করার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালী হইতে পারিতেন।

অন্যান্য মুরিদগণের মত বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবও মাঝে মাঝে সেরহিন্দ শরীফে হজরত খাজা মাসুম র. এর মজলিশে হালকায় শরীক হইতেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত মজলিশের পবিত্রতা ও নিয়মকানুন রক্ষা করিয়া চলিতেন। দিল্লীর বাদশাহ্

হওয়া সত্ত্বেও মজলিশে হজরত মাসুম র. এর সম্মুখে তিনি মুখে কিছু আরজ করিতেন না, প্রয়োজন হইলে তাঁহার লিখিত আরজি হজরতের নিকট পেশ করিতেন।

হজরত নিজে কোন মজলিশে যোগদান করিলে, অতি সাধারণভাবে মজলিশের যেখানে খালি জায়গা দেখিতেন সেইস্থানে বসিয়া পড়িতেন। তাঁহার মধ্যে কোন গর্ব বা অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না।

তাঁহার নয় লক্ষ মুরিদান এবং সাত হাজার খলিফা ছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে মুরিদগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি-অবনতির খবর রাখিতেন এবং তাহাদের হাল অনুযায়ী উপদেশ ও সবক প্রদান করিতেন। যে কোন মুরিদ বা সাধারণ লোকের বক্তব্য তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং সমস্যা ও অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিতেন অথবা অন্যভাবে সমস্যার সমাধান করিতেন। মুরিদান ও খলিফাগণের সহিত তিনি নিয়মিতভাবে পত্রের আদান-প্রদান করিতেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেককে তাহার অবস্থার উপযোগী উপদেশ ও নির্দেশ প্রেরণ করিতেন এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মারেফত সংক্রান্ত গুঢ়তত্ত্বের ব্যাখ্যাসমূহ প্রদান করিতেন। দ্বীনের কাজে এত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কঠিন নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতেই তিনি অধিকাংশ সময় নিয়োজিত থাকিতেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. সর্বাগ্রে হজরত নবী করিম স. এর শরীয়তের প্রতি গুরুত্বারোপ করিতেন। সর্বশেষ নবী হজরত রসুলুল্লাহ স. এর জামানায় সাহাবায়ে কেরামগণ যেরূপ ভাবে শরীয়ত ও সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ করিয়া পরিপূর্ণ ইমান ও একিনের সহিত সর্বোত্তম সৎ উপায়ে জীবন যাপন করিয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিল করিয়া গিয়াছেন, হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. তেমনি সর্বপ্রকার ভ্রষ্টতা ও বাতিল পথ হইতে দ্বীনের সংস্কার সাধন করিয়া ইসলামকে সেই একই ভাবে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। পরে এই কাজের দায়িত্ব হজরত মাসুম র. এর উপর আসিয়া পড়িলে তাঁহার সযত্ন প্রয়াসে বহু সুন্নত পুনর্জীবিত হইয়া উঠে এবং তাঁহার জামানায় ইসলামের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে, পিতার জীবিত থাকা অবস্থায় শেষের দিকে কাইয়ুমিয়াতের বিরাট দায়িত্ব আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার উপর অর্পিত হয়। সেই সঙ্গে সমস্ত মাখলুকাত তাঁহার মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত রহমত ও বরকতসমূহ যথাযথভাবে লাভ করিয়া তাঁহার কাইয়ুমিয়াত ও কুতুবিয়াতের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। সেই প্রাচুর্যময় রহমত ও বরকতের অবিরাম আদান-প্রদানের আধার হজরত খাজা মাসুম র. সকল সময় অত্যন্ত আজিজি ও

ইনকেসারীর সহিত সেই সৃষ্টিকর্তা ও সর্বময় প্রভুর ইবাদতে রত থাকিতেন এবং সমস্ত মাখলুকের মঙ্গলের জন্য অবিরত দোয়া খায়ের করিতেন।

রাত্রির এক তৃতীয়াংশ থাকিতে হজরত খাজা র. তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করিতেন। তিনি কমপক্ষে আট রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িতেন এবং এই নামাজে প্রতি দশরাত্রে একবার কোরআন শরীফ খতম করিতেন। প্রতি দুই রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজের পর মোরাকাবা করিতেন।

ফজরের আজানের পর দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়িয়া তিনি মসজিদে যাইতেন এবং ফরজ নামাজের ইমামতী করিতেন। নামাজ শেষে বিশ্বের মুসলমানদের জন্য দোয়া করিয়া হাজেরীনদিগের সহিত বসিতেন এবং ফয়েজ বরকতের জন্য সকলের প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করিতেন। সূর্য এক নেজা পরিমাণ ঊর্ধ্বে উঠিলে চার রাকাত এশরাকের নামাজ পড়িতেন। অতঃপর ইস্তেখারার নামাজ হইতে ফারাগ হওয়ার পর উপস্থিত সকলের খোঁজখবর লইতেন এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃকপাত করিয়া স্ব স্ব মাকামে পূর্ণতাঅর্জনকারী তালেবে-মওলাগণকে পরবর্তী উচ্চ মাকামের সবক প্রদান করিতেন এবং অন্যান্য সকলকে প্রয়োজনীয় নসিহত ও নির্দেশ দান করিতেন।

তাহার পর আল্লাহ্পাকের পাক কালাম তেলাওয়াতে মশগুল হইতেন। তেলাওয়াত শেষে দোয়ার পর চাশতের নামাজ আদায় করিতেন।

দ্বিপ্রহরের খানা শেষে দোয়া মাছুরা পাঠ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। জোহরের আজানের পর মসজিদে যাইতেন। প্রথমে দুই রাকাত তাহইয়াতুল মসজিদ এবং পরে চার রাকাত ফি-যাওয়ালের নামাজ শেষ করিয়া চার রাকাত সুন্নত নামাজ পড়িতেন। সুন্নত নামাজ শেষে ফরজ নামাজে ইমামতী করিতেন। ফরজের পর দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়িয়া আয়াতুল কুরসী পাঠ করিতেন এবং তাহার পরে আরও দুই বা চার রাকাত নামাজ পড়িয়া দোয়া করিতেন।

সাধারণতঃ জোহরের নামাজের পর দ্বীন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর গুরুত্বপূর্ণ মকতুবাত শরীফের ব্যাখ্যা করিতেন এবং মুরিদ ও খলিফাগণের নিকট পত্র ও পত্রের জবাব লিখিতেন। আজানের পর মসজিদে গিয়া দুই রাকাত তাহইয়াতুল মসজিদ ও চার রাকাত সুন্নত নামাজ শেষ করিয়া আসরের ফরজ নামাজের ইমামতী করিতেন। নামাজ শেষে দোয়া মাছুরা পড়িয়া দোয়া করিতেন এবং হাদীস শরীফ অথবা মকতুবাত শরীফ সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণমূলক শিক্ষা প্রদান করিতেন। মাগরিবের নামাজের সময় হইয়া আসিলে হজরত খাজা র. একশতবার ইস্তেগফার

পাঠ করিতেন। মাগরিবের ফরজ ও সুন্নত শেষে দোয়া মাছুরা পাঠ করিয়া ছয় রাকাত আওয়াবিনের নামাজ পড়িতেন। নামাজ হইতে ফারাগ হইবার পর মুরিদগণের হাল ও মাকামের প্রতি মনোযোগী হইতেন এবং তাঁহাদিগকে তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করিতেন।

হজরত খাজা র. সকল সময় পূর্ণ সতর্কতার সহিত ইস্তেনজার পর ভালভাবে অজু করিতেন। হজরত খাজা মাসুম র. এর দরবারে প্রতিদিন দূর-দূরান্ত হইতে বহু লোকের সমাগম হইত। হজরত প্রত্যেক কাজের জন্য নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সমস্ত কাজের আনজাম দিতেন। কয়েকজন খাস্ মুরিদ এই সকল কাজে তাঁহাকে সহায়তা করিতেন। মকতুবাতে মাসুমীয়ার অন্যতম সংগ্রহকারী ও বিশিষ্ট আলেম হাজী মোহাম্মদ আশুরা বোখারী র. পর্যায়ক্রমে উপস্থিত মুরিদগণকে হজরতের নিকট হাজির করিতেন। হজরত মাসুম র. তাঁহাদের সকলের রূহানী অবস্থা, শরীয়তের প্রতি দৃঢ়তা ও মাকামসমূহের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকের জন্য উপযোগী উপদেশ ও নির্দেশাদি ব্যক্ত করিতেন এবং ফয়েজ ও বরকতের জন্য তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করিতেন। দরবারের অন্যান্য লোক তখন খতমে খাজেগানে নিয়োজিত থাকিতেন। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার পর সময় পাইলে তিনি খতমে শরীক হইতেন এবং খতম শেষে মোনাজাতের পর লোকজনকে তরিকায় দাখিল করিতেন। বায়াত করার ব্যাপারে তাঁহার ধরাবাঁধা কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যে কোন সময়ে তিনি লোকজনকে তরিকাভুক্ত করার কাজে আগ্রহী থাকিতেন।

এশার ফরজ নামাজের পূর্বে হজরত প্রায়ই চার রাকাত নামাজ পড়িতেন। ফরজের পর দুই রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ আদায় করিতেন। অতঃপর তিন রাকাত বেতের নামাজের পর তিনি বসিয়া দুই রাকাত নামাজ পাঠ করিতেন। প্রত্যেক নামাজ শেষে তিনি নিজেকে অতি ক্ষুদ্র দীনহীন গোনাহ্গার মনে করিয়া অত্যন্ত আজিজি ও নম্রতার সহিত কাতরভাবে আল্লাহ্তায়ালার কুদরত ও রহমতের মুখাপেক্ষী হইতেন এবং গোনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সুন্দর স্বভাব ও আল্লাহ্পাকের নেয়ামতসমূহের জন্য আরজি পেশ করিতেন।

গৃহে ফিরিয়া আলিফ-লাম-মিম-সেজদা ও তাবারাকাল্লাজি পাঠ করিয়া খাইতে বসিতেন। দস্তরখানে উপস্থিত অন্যান্য সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন এবং কাহারও পাত্রে খাবার কম দেখিলে নিজ হাতে তাহার পাত্রে খাবার তুলিয়া দিতেন।

রাত্রির আহারের পর হজরত কিছুক্ষণ পায়চারী করিয়া অন্দর মহলে অপেক্ষারত মহিলাদিগকে তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করিতেন এবং অন্যান্য স্থান হইতে

আগত মহিলাগণকে যাহাতে ঘরে ফিরিয়া যাইবার পর কষ্ট করিয়া রাত্রির খাবার পাক করিতে না হয়, সেজন্য তাহাদের পরিবার পরিজনদের সকলের জন্য প্রচুর পরিমাণ আহার সামগ্রী দিয়া অত্যন্ত সম্মানের সহিত মহিলাগণকে বিদায় জানাইতেন।

রাত্রি কিছু অধিক হইলে হজরত অজু করিয়া চার রাকাত কেয়ামে লায়েল নামাজ পড়িতেন। কেয়ামে লায়েল নামাজ হইতে ফারাগ হইবার পর হজরত শায়েখ ইস্তেগফার তসবীহ্ তকবীর তেলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল হইয়া যাইতেন এবং অধিক রাত্রিতে দোয়া মাছুরা পড়িতে পড়িতে ডান দিকে ফিরিয়া শয়ন করিতেন। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য শয্যা ত্যাগ করিতেন এবং পূর্ণ সতর্কতার সহিত এস্তেনজা সমাধা করিয়া ভালভাবে অজু করিতেন। অজু করিবার সময় যখন তিনি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করিতেন তখন মনোযোগের সহিত অজুর দোয়াসমূহ পাঠ করিতেন।

হজরত খাজা র. রমজান মাসে অধিকাংশ সময় ইবাদতে রত থাকিতেন এবং কথাবার্তা কম বলিতেন। অত্যন্ত সম্মানের সহিত তিনি রমজান শরীফের মাস অতিবাহিত করিতেন এবং কোথাও সামান্য ভুল ত্রুটিও যাহাতে না হইতে পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। আম-খাস্ নির্বিশেষে সকলকে ইফতারের দাওয়াত দিতেন এবং রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে এতেক্বাফ্ করিতেন। রমজান মাসের প্রতি আরও অধিক সম্মান প্রদর্শনের জন্য খাদেম ও মুরিদগণকে তিনি কঠোরভাবে শরীয়তের নিয়মসমূহ পালন করিয়া চলার জন্য তাকীদ দিতেন এবং শায়েখের মহব্বত ও সহবত বেশী করিয়া হাসিল করিবার জন্য বলিতেন।

বড় ভাইদের প্রতি হজরত যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং সকল সময় আদব রক্ষা করিয়া চলিতেন। বড় ভাইয়ের পাল্কী যদি হজরত কখনও তাঁহার বাসগৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি সম্মানের সহিত দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং পাল্কী অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আসন গ্রহণ করিতেন না। একদা ইহা দেখিয়া জনৈক খাদেম জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, বড় হুজুরের পাল্কীতো অনেক দূরে থাকে এবং এই দিকে তিনি লক্ষ্যও করেন না, তবুও তাঁহার পাল্কী দেখিয়া হজরত কেন দাঁড়াইয়া থাকেন। উত্তরে হজরত খাজা র. বলিয়াছিলেন, তিনি আমাকে দেখার পরে আমি তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইব, ইহা আমার মকসুদ নহে।

হজরত খাজা মাসুম র. প্রায়ই গেঁটে বাতে ভুগিতেন। একবার এই বাতের আক্রমণে ব্যথার প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল এবং কোন ঔষধই ফলদায়ক হইল না। বাহ্যিক এই লক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঔষধে আর কোন ফায়দা হইবে

না। জীবনের আয়ু এখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। শুধু মালিকের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার অপেক্ষা এখন।

কিন্তু তাহার পূর্বেই তিনি গায়েব হইতে সেই আলেমুল গায়েবের ইশারা পাইয়া গিয়াছেন। অনেকের উপস্থিতিতে হজরত একদিন বলিলেন, সব হাকীমের সেরা হাকীম যিনি, তাঁহার হেকমতে ঔষধের সমস্ত কার্যক্ষমতা আমার জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন ঔষধে আর কোন উপকার হইবে না। বন্ধুর নিকট হইতে খবর আসিয়াছে, আমাকে সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল, তাহা তিনি নিজ মেহেরবানিতে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এখন শুধু শেষ প্রশংসার সময়টুকু বাকী।

ইহার পর হজরত নিজের আয়ত্বে আর কোন কিছু রাখিলেন না। এমনকি কুতুবখানা পর্যন্ত পুত্রগণের মধ্যে তক্সীম করিয়া দিলেন। কখন সেই শেষ মুহূর্তের ডাক আসিয়া পড়ে কে জানে। নিজেকে তাই তিনি সবদিক হইতে খালি করিয়া দিয়া সেই অন্তিম ডাকের জন্য নিজেকে সবদিক হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। এখন খালি হাত-পা। নিঃসম্বল তিনি, সহায়-সম্বলহীন। কোন কিছু আর তাঁহার এখতিয়ারে নাই, কেবল যাওয়ার ইনতেজার এখন। সেজন্য তৈরী তিনি। নিজেকে সবদিক হইতে তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন। ডাক আসা মাত্র সেই ডাকে সাড়া দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত।

হিজরী ১০৭৯ সনের ১০ই মহররম লোকজনকে সমবেত করিয়া হজরত খাজা র. তাহাদিগকে অসিয়ত করিলেন। বলিলেন, তোমাদিগকে সব সময় যাহা বলিয়াছি এখনও তাহাই বলিতেছি। নূতন করিয়া বলার কোন কিছু নাই। স্মরণ রাখিও, সমস্ত জীবনব্যাপী ইবাদতের মূল কথা হইতেছে, কোরআন হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা। কখনও শরীয়তের বাহিরে পা রাখিবে না। ইজমা ও মোজতাহেদগণের অভিমত অনুসরণ করিবে।

সফর মাসের শেষে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর উরস মোবারকের দিন আসিয়া পড়িল। হজরত মাসুম র. বৎসরে দুইবার উরস শরীফের আয়োজন করিতেন। প্রথমটা হজরত নবী করিম স. এর জন্য এবং দ্বিতীয়টি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর ওফাত দিবস উপলক্ষে। পিতার পবিত্র উরসের দিনে সমবেত সকলের সম্মুখে হজরত মাসুম র. বলিলেন, এই পূত-পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে জনাবে রসুলুল্লাহ স. এর ওফাত হইয়াছে। আমার বেকারার দিল তো কেবল ইহাই চাহিতেছে যে, আমিও যেন শেষ সফরে এই রবিউল আউয়াল মাসে জনাবে রসুলেপাক স. এর অনুসরণ করিয়া তাঁহার খেদমতে হাজির হইতে পারি।

উরসের পর হজরতের অসুখের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষ বিদায়ের দুই দিন পূর্বে তিনি বুজুর্গানে দ্বীন এবং প্রতিবেশী সকলের নিকট হইতে ইমান ও আখেরাতের শান্তির জন্য শেষ দোয়া চাহিয়া লিখিলেন, ফকীর মোহাম্মদ মাসুম দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইতেছে। জীবনের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তির জন্য এই ফকীর আপনাদের সকলের নিকট হইতে দোয়া ও সাহায্য কামনা করিতেছে।

ইহার জবাবে জনৈক বুজুর্গ ও শায়েখ এই কবিতা লিখিয়াছিলেন–

সংবাদের আওয়াজ পৌঁছে যায় প্রত্যেক বয়সী দরজায়,
সত্যের বাহক যারা স্মরণ কর সকলে দোয়ার আধারে,
এই পথে ময়ুরের সাথে বাঘ খাঁটি বন্ধুত্ব পাতায়,
মাটিও এখানে বেকারার রয় সেই দোস্তির খাতিরে।

ওফাতের আগের দিন হজরত মসজিদে নামাজ পড়িয়া বলিলেন, আগামীকাল এই সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকিব এমন আশা করি না। ইহার পর সংক্ষেপে সকলকে নসিহত করিলেন। পরদিন অর্থাৎ ওফাতের দিন ভোরে ফজরের নামাজ পড়িয়া হজরত শেষবারের মত মোরাকাবায় বসিলেন। মোরাকাবার পর যথা সময়ে ইশরাকের নামাজ আদায় করিলেন।

ইশরাকের নামাজ শেষ হওয়ার পরে তাঁহার শেষ ডাক আসিয়া পড়িল– যে ডাক আসিবার সাথে সাথে সাড়া দিবার জন্য তিনি সযত্নে নিজেকে এতদিন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম উরওয়াতুল উসকা কুদ্দিসা সিররূহ ৭২ বৎসর বয়সে ১০৭৯ হিজরীর নয়ই রবিউল আউয়াল 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিতে বলিতে এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়া অনন্তলোকের দিকে চলিয়া যান। হজরতের কোন কোন সাহেবজাদা বলেন, সেই সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হজরতের ঠোঁট নড়িতেছিল এবং তিনি তখন সূরা ইয়াসিন পড়িতেছিলেন।

মৃত্যুকালে হজরত ছয় পুত্র এবং ছয় কন্যা ছাড়াও নয় লক্ষ মুরিদান এবং সাত হাজার খলিফা রাখিয়া যান। পুত্রগণ তাঁহার পবিত্র সহবতে থাকিয়া ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সকলেই কামেল ছিলেন। হজরতের পুত্রগণের নাম যথাক্রমে– (১) মোহাম্মদ সেবগতউল্লাহ র. (২) শায়েখ মোহাম্মদ নকশ্‌বন্দ হুজ্জতউল্লাহ র. (৩) শায়েখ মোহাম্মদ আবিদউল্লাহ র. (৪) শায়েখ মোহাম্মদ আশরাফ র. (৫) শায়েখ মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন র. ও (৬) শায়েখ মোহাম্মদ সিদ্দিক র.।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর পঞ্চম পুত্র হজরত শায়েখ সাইফুদ্দিন র. এর দ্বারা দ্বীন ইসলামের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং মোজাদ্দেদিয়া তরিকা আরও অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হজরত সাইফুদ্দীন র. এর বংশের অন্যান্য আওলাদগণ হজরত মোহাম্মদ স. এর নির্দেশিত পথে ইসলামী শিক্ষাকে

সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সতত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হজরত শাহ্ আব্দুল গণী মোজাদ্দেদী ফারুকী র. হাদীসে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি হজরত মাওলানা নানতুভী র. এবং হজরত মাওলানা গাঙ্গুহী র. এর মত স্বনামধন্য কামেল বুজুর্গানে দ্বীনের হাদীসের ওস্তাদ ছিলেন। শাহ্ আব্দুল গণী র. এর পিতার নাম হজরত শাহ্ আবু সাঈদ র., পিতামহ হজরত সফিউল কাদের র, প্রপিতামহ হজরত আজিজুল কাদের র. এবং প্র-প্রপিতামহ ছিলেন হজরত শাহ্ ঈসা র.– যিনি হজরত সাইফুদ্দীন র. এর পুত্র ছিলেন।

হজরত খাজা মাসুম র. এর নূরান্বিত মাজার শরীফ সেরহিন্দে আজও লক্ষ লক্ষ তরিকাভুক্ত ও আশেকগণের হৃদয়ে নূরের শামাদান জ্বালাইয়া দেয়।

বিখ্যাত ফারসী কবি নাসির আলী সেরহিন্দী হজরতের শানে তাঁহার ওফাত দিবসে এই সুন্দর কবিতাটি লিখেনঃ

নকশ্‌বন্দিয়া খান্দানের যে সেরা নক্ষত্র
দ্বীনের জ্যোতিতে আলোকময় সে তো খাজা মাসুম,
বিরান মুলুক হতে যে চলে গেল সেই অনন্ত
আবাদের পানে চির সবুজ বাগানে নহর মর্মরে;
যখন শুধাই নিজেকে কখন ঘুমাল সে শেষ ঘুম,
ওপার থেকে ধ্বনি এলো ভেসে, যে গেছে সে গেছে চিরতরে।

ফারসীতে লেখা এই কবিতার বিশেষ হরফগুলির সংখ্যাভিত্তিক মান হইতে হজরত খাজা মাসুম র. এর ওফাতের হিজরী সন নির্ধারণ করা যায়।

হজরত নবী করিম স., তাঁহার আহলে বায়াত, সাহাবায়ে কেরাম, শরীয়তের দৃঢ় অনুসরণকারী ও সুন্নত পালনকারী মকবুল ও ইমানদার উম্মতগণের সহিত হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. ও হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর উপরেও অনন্তকালব্যাপী আল্লাহ্‌তায়ালার অফুরন্ত অনুগ্রহের ধারা বর্ষিত হউক। আমীন।

শমশের খানের নিকট
লিখিত। মকতুব নং–১

আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার অনুগ্রহ দ্বারা যেন তোমার নিজ সৌভাগ্যের অস্তিত্ব ও প্রাচুর্যের ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখেন এবং মুস্তফা স. এর সুন্নতের আনুগত্য দ্বারা তোমাকে সুসজ্জিত করেন। মোহাম্মদ হানিফ তোমার সহৃদয়তা সম্পর্কে অনেক কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে নসিহতপূর্ণ একটি পত্র তোমার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ অনুরোধের খাতিরে সাধারণভাবে সংক্ষেপে সামান্য কিছু লিখিলাম।

হে আল্লাহ্র বান্দা, মনে রাখিও, আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে কখনও অর্থহীনভাবে সৃষ্টি করেন নাই এবং তাহাকে তাহার মর্জি বা খেয়াল খুশীর উপর ছাড়িয়া দেন নাই যে, সে নিজ ইচ্ছামত যাহা খুশী তাহা করিবে এবং ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া জীবন যাপন করিবে। বরং আল্লাহ্তায়ালা মানুষ এবং এই দুনিয়ার সব কিছুকে কোন না কোন উদ্দেশ্যের সহিত সৃষ্টি করিয়া সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দেশাবলীর মুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সেই সমস্ত হুকুম-আহকাম অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা এবং তাঁহার অভিপ্রায় ও নির্দেশের বরখেলাপ আকাংখাসমূহকে পরিত্যাগ করা ছাড়া কোন উপায় নাই। তাহা যদি পালন না করা হয় তাহা হইলে স্বেচ্ছায় হক মাওলার গজব ও ক্রোধের এবং আজাব ও যন্ত্রণার দাবীদার হিসাবে পরিগণিত হইতে হইবে। সেই ব্যক্তি সত্যিই সৌভাগ্যবান, যিনি মওলার হুকুমসমূহ তামীল করিবার জন্য হিম্মতের সহিত কোমর বাঁধিয়াছেন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করিবার জন্য সর্বদা সেই খেয়ালে ও ফিকিরে রত রহিয়াছেন।

এই দুনিয়া প্রকৃত পক্ষে কৃষিকার্যের স্থান। কৃষিকার্যের সময় আরাম ও আয়েশে মশগুল থাকা হইতে এবং নশ্বর আনন্দে জড়িত রাখা হইতে নিজেকে সর্বদা দূরে রাখিতে হইবে। কারণ দুনিয়াতে সঠিক পদ্ধতির (সহি তরিকার) উপর জীবন যাপন করিতে পারিলে তবে আখেরাতে তাহার (দুনিয়ার কৃষিকার্যের) ফল ভোগ করা যাইবে। কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের ইচ্ছানুযায়ী জীবন

যাপনের চিরস্থায়ী আনন্দকে পরিহার করিয়া ক্ষণিকের জন্য ধ্বংসশীল আনন্দের প্রতি কখনও প্রণয়াসক্ত হইতে পারে না।

সঠিক আকিদার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের (যাহারা আল্লাহ্পাকের কিতাব ও সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছেন) সান্নিধ্য লাভ করা বিশেষ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ যথাযথভাবে পালন করিতে এবং নিষিদ্ধ বস্তু ও কার্যসমূহ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে না পারিলে সমস্ত কিছু ব্যর্থ ও বিফল হইয়া যাইবে।

নামাজ ¾ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ততম আনুগত্য ও ভক্তি নামাজের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। নামাজ হইতেছে দ্বীনের স্তম্ভ যাহা মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান স্বরূপ। আর নামাজ আদায়ের সময় যে নৈকট্য লাভ করা যায়, নামাজের বাহিরে তাহা অর্জন করা দুঃসাধ্য। কাজেই কলবের সমস্ত একাগ্রতা, হুজুরি, তা'দীলে আরকান ও পরিপূর্ণ অজুর সহিত সময়মত মুস্তাহাবসহ পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সহিত পড়িতে হইবে।

জাকাত ¾ অর্জিত অর্থ হইতে আগ্রহের সহিত জাকাত প্রদান করা উচিত। হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে যে, সদ্কা ও জাকাত দ্বারা ধন ও মালের পরিমাণ কমে না। আল্লাহ্তায়ালার দয়া-দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং খরচের পর যে ধনমাল উদ্বৃত্ত থাকে তাহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১/৪০ অংশ জাকাতের জন্য ফরজ করা হইয়াছে। জাকাত প্রদানে আমরা যদি অলসতা করি কিংবা কোনরকম গড়িমসি করিয়া জাকাত প্রদান করা হইতে বিরত থাকি, তাহা হইলে সত্যিই বড় বে-ইনসাফী করা হইবে। জান এবং মাল সমস্ত কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা। যদি আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত ধন দৌলত ফকির-মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য আদেশ করেন এবং এই জীবনকে তলব করেন তবু আল্লাহ্তায়ালার নেক বান্দা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জান ও মালের উৎসর্গ করাকে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবে।

যদি সেই মিলনই তোমার একান্ত কাম্য হয়
এবং মনে কর তা প্রাণের চেয়ে ঢের দামী,
তবে নিরলস খুঁজে নাও সে আস্বাদ বরাভয়,
মিলনের সাথে জীবনের মালিকও তো অন্তর্যামী।

রোজা ¾ মাহে রমজানে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত রোজা রাখিতে হইবে। রমজানের এই তাৎপর্যপূর্ণ 'ক্ষুধা ও তৃষ্ণা'কে নিজের পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে, আদম আ. এর সন্তানগণ (ইবনে আদম) অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিটি সৎ আমলের জন্য দশগুণ হইতে

সাত শতগুণ পর্যন্ত ছওয়াব লাভ করে। আর আল্লাহ্তায়ালা বলেন, রোজা (যাহার ছওয়াব পরিমাণ দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না) কেবল মাত্র আমার জন্য– ইহার পুরস্কার আমি নিজে ন্যায়পরায়ণতার সহিত খুশীমত দান করিব (অর্থাৎ আমি নিজেই তাহার পুরস্কারস্বরূপ হইয়া যাইব)। ইনসান তাহার খায়েশ-খুশী ও পানাহার কেবল মাত্র আমার জন্য পরিহার করে– যাহার ফলস্বরূপ সেই সমস্ত রোজাদারের জন্য দুইটি সুসংবাদ রহিয়াছে, যাহার মধ্যে একটি সে ইফতার করার সময় লাভ করে এবং দ্বিতীয়টি সে সেই সময়ে পাইবে, যখন সে তাহার রবের সহিত মিলিত হইবে। রোজাদারের মুখের (পেট খালি থাকার জন্য এক বিশেষ ধরনের) গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মেশ্কের খোশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধদায়ক। রোজা হইতেছে ঢাল অর্থাৎ সকল পাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্মস্বরূপ। যখন তোমাদের মধ্যে কেহ রোজা থাকে, তখন সে যেন কোন বেহুদা কাজ না করে এবং কেহ যদি তাহাকে কোন খারাপ কথাও বলে তাহা হইলে সে তাহাকে বলিয়া দিবে (অথবা নিজের অন্তরকে বলিবে) আমিতো রোজাদার। (বোখারী ও মুসলিম)।

হজ্ব ¾ শরীয়তের বিধান মোতাবেক করণীয় হইলে অবশ্যই হজ্ব করিতে হইবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফের অসিলায় আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। হাদীস শরীফে আছে, কবুল হজ্বের ছওয়াব হইতেছে জান্নাত।

মুসলমানী বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে শাহাদতে তৌহিদ অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্ববাদে সাক্ষী সম্পর্কিত এবং তাঁহার প্রেরিত বাণী ও পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস। বাকী চারটি সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পাঁচটি জিনিসের মধ্যে যদি কোন একটি বাকী বা অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে দ্বীনের আবাসস্থল বিরান থাকিয়া যাইবে এবং কাজ-কর্ম অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। সঠিক আকায়েদ ও সৎকার্যাদী পালন করার পর 'সুলুকে তরীকায়ে সূফীয়া' অর্থাৎ সূফীবাদের পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করাও অত্যন্ত জরুরী, যাহাতে 'মারেফতে হক' অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার পরিচিতি লাভ করা যায় এবং কুপ্রবৃত্তিপূর্ণ কামনা ও বাসনাসমূহের প্রতারণা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। আমি

টীকাঃ হজরত খাজা মাসুম র. এর সময়ে এই একই নাম ও উপাধিধারী তিন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়ঃ ১। 'শমশের খান বিন আলী খান তরীন– যাঁহার সম্পর্কে রামপুর রেজা লাইব্রেরীতে রক্ষিত তারিখে মোহাম্মদীর পাণ্ডুলিপি হইতে জানা যায় যে, শাহ্জাহান ও আলমগীরের রাজত্বকালে তাঁহার পিতা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি কাবুল উপত্যকায় অবস্থিত কেল্লায় ১০৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। শমশের খানের মৃত্যু হয় ১০৮৩ হিজরীতে। ২। মীর মোহাম্মদ ইয়াকুব (যিনি শমশের খান নামে সমধিক পরিচিত) বিন শেখ মীর বিন মীর মোহাম্মদ জান খোয়ানী। তিনিও বাদশাহ আলমগীরের ওমরাহগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আফগানিস্তানের কাবুল যুদ্ধে তিনি নিহত হন বলিয়া তারিখে মোহাম্মদী হইতে জানা যায়। ৩। শমশের খান ইবনে শের খান ছিলেন বাদশাহ শাহজাহানের ওমরাহগণের মধ্যে একজন। তারিখে মোহাম্মদীর তথ্য অনুযায়ী ১০৫২ অথবা ১০৫৩ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই পত্রের মালিক সম্ভবতঃ মীর মোহম্মদ ইয়াকুব যাহাকে সকলে শমশের খান বলিয়া চিনিত।

বুঝিতে পারি না, কোন বান্দা তাহার স্রষ্টার মারেফত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া এবং স্রষ্টাকে না চিনিয়া কেমন করিয়া জীবন যাপন করিতে পারে এবং কিভাবে সে অন্যান্য বস্তুসমূহের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার হাল তো এই রকমই হওয়া উচিত ছিল–

এই ব্যাকুল হৃদয় আর তৃষ্ণার্ত দু-চোখ
খুঁজিয়া পেয়েছে কাজ ত্যাজি সব কিছু,
চোখ দুটি শুধু তোমারে খুজিয়া মরে,
মন ছুটে চলে তোমারই পিছু পিছু।

মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং–২

পূর্ণ মনোযোগসহকারে আদবসমূহ প্রতিপালন না করিলে কখনও ফয়েজ ও তরিকার বরকত পাওয়া যায় না। কোন বে-আদব আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। অন্তরের সহিত আদবের সম্পর্ক না থাকিলে ক্ষতির পাল্লা বলবান থাকে এবং লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

তোমাকে লিখিবার মত অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, সঠিকভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার কর এবং মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সময় ব্যয় কর। বিনা কাজে সময় যাহাতে অতিবাহিত না হইয়া যায় সেদিকে খেয়াল রাখ। লোকজনের সহিত অধিক মেলামেশা হইতে নিজেকে বিরত রাখিবে, কেননা বিনা প্রয়োজনে অধিক মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা– 'নেসবতে বাতেন' অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে সংযোগের উজ্জ্বল আলোকরশ্মিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। সৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত মাখলুকের (সৃষ্টির) সহিত বেশী মেলামেশা সৃষ্টিকর্তার সহিত বিচ্ছেদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বদ লোকের সঙ্গ হইতে পরহেজ কর। অর্থাৎ দূরে থাক এবং ভাল ও নেক লোকের সঙ্গে সেই পরিমাণ সহবত রাখ যাহা আল্লাহ্তায়ালার সহিত সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে কোন রকম বিঘ্ন বা দূরত্বের কারণ না হইতে পারে।

নিজ মুরিদান ও ভক্তবৃন্দের সহিত এমন ব্যবহার করিবে– যেন তাহাদের দৃষ্টিতে তোমার ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব কায়েম থাকে। বাহ্যিক লৌকিকতা পূর্ণ এমন ব্যবহার করিবে না যাহার কারণে সে উদ্ধত হইতে পারে এবং তাহার সংশোধনে বিপত্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। ইদানিং অত্যন্ত শোকাভিভূত ও ব্যথিত থাকার কারণে আর অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না। শোকাভিভূত থাকার কারণ হইতেছে, ১০৫০ হিজরী সনের ৭ই জিলহজ্ব সোমবার রাত্রে আম্মাজান (হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর স্ত্রী) আমাদিগকে ছাড়িয়া আখেরাতের সফরে চলিয়া গিয়াছেন এবং আত্মীয়স্বজন সকলকে তাঁহার শোকে কাতর করিয়া বিলাপরত অবস্থায় ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার অজুদ মোবারক অর্থাৎ পবিত্র অস্তিত্ব দ্বীন দুনিয়ার সুখ ও সৌভাগ্য লাভের অসিলা এবং মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য বাতায়নস্বরূপ ছিল। এখন সেই পথ হইতে ফয়েজ প্রাপ্তি বন্ধ হইয়া গেল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজিউন।

আত্মীয়স্বজন এবং আপনজনেরা যেন তাঁহার জন্য ইসালে ছওয়াব করেন।

মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৩

আল্লাহ্পাকের জন্য সকল প্রশংসা, তাঁহার রসুলের জন্য দরূদ ও সালাম জ্ঞাপনের পর জানাইতেছি যে, এইদিকের ফকিরের অবস্থা কৃতজ্ঞতার যোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্তায়ালার নিকট তোমার সালামতী, শারীরিক সুস্থতা, শরীয়তের প্রতি অটল স্থৈর্য এবং মৌলিক দরযাতের (উচ্চস্তরসমূহের) উন্নতি প্রার্থনা করিতেছি।

হে সম্মানীয়, মৃত্যুর ব্যাপারে আঁচ-অনুমান তো মনে হইতেছে এবং (মৃত্যুর জন্য) নির্ধারিত সময় অতি নিকটবর্তী; কিন্তু আমার দ্বারা কোন কাজই হইল না। এত দূরবর্তী সফরের জন্য এখনও পর্যন্ত কোন সামান (সাজসরঞ্জাম) গোছগাছ করা হইল না।

মৃত্যু দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তাহার পর ভয়াবহ প্রকম্পন ও বিস্ফোরণও হয়তো আসন্ন। হায়, এখন আক্ষেপ হয়, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকাল কামনা বাসনার লালসাতেই কাটিয়া গেল। এখন তো নির্মম সত্যের মত স্পষ্ট, বার্ধক্যের এই অকেজো নিষ্কর্মা জীবনে আর এমন কী করা সম্ভব হইবে এবং এই সময়ের আমলের উপরই বা আর কতটুকু বিশ্বাস রাখা যায়। মূর্খতার কারণে লজ্জায় অবনত মুখ শরমে তুলিতে পারিতেছি না এবং আখেরাতে পেশ করিবার মত কোন ওজর আপত্তি মাথায় আসিতেছে না। জনৈক কবি কি সুন্দরভাবেই না বলিয়াছেনঃ-

পাপের সাফাই গেয়ে করবে হাজির কোন সে ওজর,
ঘামের বদলে যে কেবল মুখ ঢেকে খুন যায় ঝরে–
করতে গিয়ে প্রকাশ শুধু কেঁদে মরে বাহির ভিতর
তার মাঝে ফের পাপ এসে যে বাড়ায় মরণ অন্তরে।

মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের জন্য ও তাঁহার রসুলের প্রতি দরূদ ও সালাম। তোমার লিখিত সুন্দর পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। পত্রে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম এবং উচ্চ পর্যায়ের।

'বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার এলেম (জ্ঞান)কে তুমি বাড়াইয়া দাও' (আল কুরআন)। মুরিদদের দেখাশোনা ও সংশোধনের কাজে সর্বদা পরিশ্রমী ও বে-আরাম থাকিবে। শীতল কলব ও বে-ফিকিরী (উদ্বেগহীন) অবস্থা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও পরকাল সম্পর্কে ভয়-ভাবনাহীন নিরুদ্বেগ অবস্থা) যেন আল্লাহ্‌তায়ালা দুশমনদের জন্য নির্ধারিত রাখেন।

টীকাঃ নিজ পুত্রগণ ব্যতীত মাওলানা মোহাম্মদ হানিফ র. হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী র. এর প্রথম খলিফা ছিলেন। খেলাফত দেওয়ার পর তাঁহাকে কাবুলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেখানে প্রতিবেশী ও নিকটবর্তী এলাকা হইতে অগণিত লোক তাঁহার মুরিদ হইয়াছিলেন। নিজ পীর ও মোর্শেদ কেবলা জীবিত থাকিতেই তিনি ১০৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁহার দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর কারণে মোর্শেদ হজরত খাজা মাসুম র. অত্যন্ত শোকাহত হইয়া পড়েন। তাঁহার মাজার শরীফ কাবুলের নিকটে আমাখাতুগাঁওয়ে অবস্থিত (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া দ্বিতীয় খণ্ড)।

একজন বুজুর্গ বলিয়াছেন, দুর্ভাবনা ও অশান্তির নামই হইতেছে তাসাওফ (সূফীবাদে আল্লাহ্‌র সন্ধানে রত থাকা)। যখন শান্তি আসে তখন আর তাহা তাসাওফ থাকে না। প্রেমিক কখনও দুর্ভাবনা ও ব্যথাহীন অবস্থায় থাকিতে পারে না। দুঃখকষ্টের মর্মজ্বালা ব্যতীত কোন আরেফের অস্তিত্ব নাই। এই পৃথিবীর গর্ব এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্তবাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভাবনা যেখানে তুলনাহীন সেখানে অন্যান্যদের প্রসঙ্গে আর বলার কী থাকিতে পারে।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া আ'লা আহলে বাইয়িতুকুম।

মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৫

সম্মানীয় ভ্রাতা মওলানা মোহাম্মদ হানিফ, নবী করিম স. এর সুন্নত অনুসরণ ও পায়রবির জন্য সালাম। অনেক দিন হইতে তোমার কোন সংবাদ পাই নাই, যে জন্য চিন্তায় আছি।

সময় কেবলমাত্র কাজ করিবার জন্য। কথাবার্তায় সময় নষ্ট করিবার মত সময় নাই। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে কান্নাকাটি করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনার দ্বারা রাত্রির কালো অন্ধকারকে রওশন (আলোকময়) করিয়া তোল এবং কলেমা তৈয়বের প্রাচুর্য দ্বারা সকল সময় জিহ্বাকে সিক্ত রাখ। অভ্যন্তরীণ অবস্থাদৃষ্টে অবসর সময়ে কোরআন মজিদ তেলওয়াতের মাধ্যমে অধিক সন্তুষ্টি সঞ্চয় করিয়া লও। দীর্ঘ কেরাত দ্বারা নফল নামাজ পড় এবং যত্নের সহিত শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আকৃষ্ট থাকার চেষ্টা কর।

মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৬

আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা এবং নামাজ ও রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুসরণকারীদের প্রতি সালামের পর জানাইতেছি যে, এখানকার ফকিরের অবস্থা ও হাল হকীকত আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় প্রশংসার উপযুক্ত। দীর্ঘকাল যাবৎ তোমার কোন চিঠিপত্র পাই নাই– পাওয়ার অপেক্ষায় আছি।

আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রকার নিরাপত্তা, উত্তম স্বাস্থ্য ও শান্তির মৌলিক ধারা (যাহা সেই স্রষ্টা ও প্রভুর ইবাদত বন্দেগী করিয়া পাওয়া যায়) প্রদান করুন এবং বিপদ-আপদ হইতে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ রাখুন।

মৃত অথবা মৃতপ্রায় সুন্নতসমূহকে জীবিত করার জন্য সাহসের সহিত কোমর বাঁধ। বিশেষ করিয়া সেই সময়, যখন বে'দাত ও অধর্মের অন্ধকার বিশ্ব-জগতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তখন মৃত ও মৃতপ্রায় সুন্নতসমূহকে জীবিত করা সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কাজ। আঁ হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার কোন মৃত সুন্নতকে যদি কেহ জীবিত করে, তাহা হইলে সে একশত শহীদের সওয়াব পাইবে– এই হাদীস তুমিও শুনিয়া থাকিবে। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোকদের সংসর্গের (সহবতের) প্রতি আকৃষ্ট হইও না। দারিদ্রতাকে মূল্যবান বলিয়া মনে করিবে এবং মনে প্রাণে সংযম ও পরহেজগারীর আকাংখায় রত থাকিবে। কোন পাপকে ছোট মনে করিবে না।

বহু দূরে পড়িয়া থাকা এই পত্র লেখককে দোয়া ও খায়েরের সঙ্গে স্মরণ রাখিও।

যে কাজ রয়েছে আহা সম্পদে ভরপুর
কাকে তুমি দিবে তুলে সেই পূতঃনূর।
ওয়াস সালামু আলাইকুম।

হাজী মোহাম্মদ আ'শুর বোখারীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং–৭

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্তুফা– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হউক।

বিশ্বের সরদার, সৃষ্টির গৌরব হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, এমন কি মহৎপ্রাণ সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিআল্লাহু আলায়হিম আজমাইনগণ যাঁহারা আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সহবতের বরকতে, ধর্মে পরিপূর্ণতা, আল্লাহ্তায়ালার উপর নির্ভরশীলতা ও মুখাপেক্ষিতা, সত্য ও ন্যায়ের জন্য সহিষ্ণুতা, অনমনীয়তা ও নির্ভীকতা, ধৈর্য ও ত্যাগ, সহনশীলতা ও অল্পে সন্তুষ্ট থাকার মত প্রশংসিত গুণাবলীর জন্য অমর ও তুলনাহীন হইয়া আছেন– তাঁহাদের হৃদয় ও দেহের (কলব ও কারাবের) গভীরে, আকৃতিগত এবং প্রকৃত মূলতত্ত্বের (সুরত ও হকীকতের) এই সংযোগ এবং এই সকল পরিপূর্ণতা সর্বাংশে উজ্জ্বল দ্যুতির সমন্বয়ে সজ্জিত হইয়া থাকিত। বাকী সমস্ত উম্মতগণ যত চেষ্টা এবং কষ্ট করুক না কেন, ঐ রকম সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাইতে পারিবে না এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। খুব বেশী হইলে উচ্চ মর্তবার মর্যাদাসম্পন্ন পীরদরবেশগণের (মাশায়েখের) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আকৃতি (সুরত) হইতে এই সংযোগ সম্পর্কে কিছু আঁচ-আন্দাজ করা যায় এবং প্রাণপণ চেষ্টা চরিত্র দ্বারা সম্মানিত সাহাবাগণের জাহেরী মিল হাসিল করা যায়।

টীকাঃ হাজী মোহাম্মদ আ'শুর বোখারী হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর অন্যতম খলিফা এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। পীর ও মোর্শেদ তাঁহার উপর অত্যন্ত মেহেরবান ছিলেন। তিনি মকতুবাতে মাসুমীয়ার একটি খণ্ড (জিলদ) সংকলন করিয়া ছিলেন (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড)।

মোল্লা আবদুর রাজ্জাকের নিকট
লিখিত। মকতুব নং–৮

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্তাফা– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হউক।

ভাই মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, যাহার জবাব অবকাশ মত প্রয়োজন অনুযায়ী লিখিত হইল।

প্রথম ও ষষ্ঠ প্রশ্নের জিজ্ঞাসা ছিল, তরিকায় দাখেল হওয়ার পূর্বে তিনি যে সমস্ত তসবীহ তাহলীল ও কোরআন শরীফের সুরাসমূহ নিয়মিতভাবে অজিফা হিসাবে পাঠ করিতেন, তাহা এখনও পড়া যাইবে কি না, তাহাজ্জুদ ও চাশতের নামাজ পূর্বের মত এখনও জারি থাকিবে কিনা এবং ফেকাহ্ ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি অধ্যয়নসহ কোন কোন নির্দিষ্ট সূরা এখনও মুখস্থ করা যাইবে কি না?

ইহার জবাব হইতেছে, তরিকতে আসার পর প্রাথমিক অবস্থায় ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মোয়াক্কাদা ব্যতীত আর অন্য কোন কিছু নির্ণয় করা হয় না– তরিকাভুক্তদের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় আমি ইহা নির্ধারিত করিয়া থাকি। যেহেতু তুমি এই প্রাথমিক অবস্থা হইতে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছ, সেই হিসাবে তোমার উচ্চ পর্যায়ের জন্য সুন্নত অনুযায়ী তসবীহ্ তাহলীল ছাড়াও জিকির, তাহাজ্জুদ, চাশত ও আওয়াবিনের নামাজ পড়ার অনুমতি রহিল। ইহা ব্যতীত অতিরিক্ত সুন্নতসমূহও তুমি পালন করিবে। তাহাজ্জুদের নামাজ এবং অধিক রাত্রি জাগিয়া ইবাদত করাকে তো সুফিগণের তরিকার অত্যাবশ্যকীয় অংশ বলা যাইতে পারে।

শিক্ষাদীক্ষা তরিকতের পরিপন্থী নয়। বরঞ্চ এই কাজ যদি বিশুদ্ধ নিয়তে করা হয় তাহা হইলে উহা বাতেনী নেসবতের (অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের) জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে। আনন্দের সহিত দ্বীনি কেতাবসমূহের পড়াশুনায় মশগুল থাক এবং শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আগ্রহী হও। অবশ্য শিক্ষার ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন কর এবং বাকী সময়কে জিকির ও ফিকিরের (স্মরণ ও চিন্তার) মাধ্যমে পরিপূর্ণ করিয়া তোল। কোরআন শরীফের সুরাসমূহও অবশ্যই মুখস্থ করিবে।

টীকাঃ মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর অন্যতম খলিফা ছিলেন (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া দ্বিতীয় খণ্ড)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, ফরজ ও সুন্নত ব্যতীত অন্য কোন আমল কোন বুজুর্গের অনুমতি ছাড়া যেন করা না হয়– এই কথা জনসাধারণের মধ্যে মশহুর হইয়া আছে, তাহা কতদূর সত্য?

ইহার জবাব হইতেছে, যে সমস্ত আমলে হুসনা (সৎ কার্যাবলী) সম্পর্কে আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সাধারণভাবে বর্ণিত হইয়াছে– যাহা আঁ-হজরত স. এর বিশেষ অংশের মধ্যে নয়, তাহা আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করিবার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং হুজুর স. এর আমল তাঁহার সমস্ত উম্মতের জন্য চিরস্থায়ী অনুমতি ও সনদ।

অবশ্য কিছু কিছু আমল ও জিকির এবং দোয়া-দরূদ যাহা সাংসারিক হাজত (প্রয়োজন) পূরা হওয়ার জন্য এবং মুশকিল আসানের ব্যাপারে চেষ্টা করার জন্য রহিয়াছে, তাহার উপযোগিতা মোর্শেদ অথবা ওস্তাদের অনুমতি সাপেক্ষে নির্ধারিত হইয়া থাকে।

হাজী হারমেন মীর গজনফরের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৯

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁহার রসুলের জন্য দরূদসমূহ। আল্লাহ্তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি যে, তুমি সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে উপনীত হইয়াছ, হজ্ব ও ওমরা সম্পন্ন করিয়াছ, সেই সঙ্গে পবিত্র স্থানসমূহ (মোকামাতে মোকাদ্দস) এবং ইহকাল ও পরকালের নেতা (সরদার) রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারত করার সৌভাগ্য তোমার হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে ঐ সমস্ত এলাকার খাস্ বরকতসমূহের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছ। ইহার পরে জামাতের সঙ্গে ভালভাবে নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছ।

টীকাঃ মীর গজনফর বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বকালে একজন বিশিষ্ট ওমরাহ ছিলেন। তিনি ১১ই রমজান ১০৯১ হিজরীতে আজমীরে ইন্তেকাল করেন (তারিখে মোহাম্মদী, রেজা লাইব্রেরী রামপুর)। রওজাতুল কাইয়ুমিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহাকে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর খলিফা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমার কাছে তুমি জলদি চলিয়া আস, আমি অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি এবং কাবাশরীফের তীর্থযাত্রীর যে মকসুদ পূর্ণ হইয়াছে তাহার দোয়া ও বরকতের প্রত্যাশায় আছি।

কাছে এস, আরও কাছে, নিভৃত সান্নিধ্যে
তবে তো পরিচয় হবে দু'জনের মধ্যে।

একজন পুণ্যময়ী খাতুনের
নিকট লিখিত। মকতুব নং–১০

আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, নিজের জীবদ্দশায় নিজের জন্য কবর তৈরী করিয়া রাখা সুন্নত তরিকা অনুযায়ী জায়েজ কিনা?

ইহার জবাব হইতেছে, হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুয়তকালে, খোলাফায়ে রাশিদীনের সময়ে ও সাহাবায়ে রাদিআল্লাহু আলায়হিম আজমাঈনদিগের নিকট হইতে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য ওমর বিন আব্দুল আজিজের মত উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যক পূর্বজামানার ব্যক্তি-বিশেষ হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা নিজেদের জীবদ্দশায় নিজ নিজ কবর তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন। আলেম-ওলামাগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন রকম মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই ব্যাপারে কড়াকড়ি করার পক্ষপাতী, কেহ কেহ উদারপন্থী আবার কেহ বা দেখিয়া শুনিয়া ইহা গ্রহণ করেন।

আপনার অন্য প্রশ্ন ছিল, খাওয়ার ব্যাপারে আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস (আ'দত শরীফ) কি রকম ছিল?

ইহার জবাব হইতেছে, আঁ-হজরত স. প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত পরিমাণ আহার গ্রহণ করিতেন– যে পরিমাণ আহার দেহের ভারসাম্যের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। তিনি পেট ভরিয়া আহার করিতেন না। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. হইতে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত হইতে জানা যায়, রসুলেপাক স. কখনও পেটকে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ করিয়া আহার গ্রহণ করিতেন না। আহারের সময় যে খাদ্যের সহিত সবচেয়ে বেশী হাত অংশগ্রহণ করিত অর্থাৎ বেশী লোক তাঁহার সহিত

আহারে শরীক হইতেন, সেই খাবার ছিল রসুলুল্লাহ্ স. এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও রুচিকর খাবার। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, রসুল স. এরশাদ করিয়াছেন, আদম সন্তানের খাওয়ার জন্য কয়েক লোকমা (গ্রাস) খাবারই যথেষ্ট, যাহা তাহার পিঠকে সোজা রাখিতে পারে। যদি সেই পরিমাণ খাবারে সে সবর করিতে না পারে তাহা হইলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস গ্রহণের জন্য থাকিবে। আহার আরম্ভ করিবার সময় তিনি বিসমিল্লাহ্ পড়িতেন এবং এই আমল হইতেছে সুন্নতে মোয়াক্কাদা।

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় আঁ-হজরত স. এর ঘুমের পরিমাণও পরিমিত ছিল। তাঁহার হৃদয় (দিল মোবারক) ঘুমাইত না, কেবলমাত্র তাঁহার চক্ষুদ্বয় নিদ্রায় শায়িত থাকিত।

আঁ-হজরত স. এর পোশাক কয়েক রকমের ছিল। তিনি সুন্দর মনোরম পোশাক দ্বারা তাঁহার দেহকে সজ্জিত করিয়াছেন, আবার মামুলী ধরনের সাধারণ পোশাকও পরিধান করিয়াছেন। সুতি কাপড়ের পোশাক তিনি বেশীর ভাগ ব্যবহার করিতেন এবং মাঝে মাঝে পশমী পোশাকও পরিধান করিতেন। মোদ্দা কথা এই যে, পোশাকের ব্যাপারে তাঁহার কোন প্রকার লৌকিকতা ছিল না, যে সময়ে যাহা পাইতেন তাহাই পরিধান করিতেন।

সোমবার ছিল, হজরত মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাব ও তিরোধানের দিবস। দিনের শেষ ভাগে তাঁহার ওফাৎ হইয়াছিল। মঙ্গলবার অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবার মধ্যাহ্ন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতের সূত্র অনুযায়ী রাত্রির শেষাংশে আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দেহ মোবারকের দাফন সম্পন্ন হইয়াছিল।

আহা ওই সুন্দর দাফন, যার অভ্যন্তরে
শায়িত পবিত্রতম তাঁর দেহ মোবারক,
যার খোশবুতে আপ্লুত সারা ময়দান
রাতের প্রহরগুলো যার সাক্ষী বেশক;
যেখানে এখন থেকে আপনার বসবাস
সেখানে আমার হৃদয়কে করলাম উৎসর্গ,
পরম সম্মানীয় যে কবর কেবল থেকে যাবে
হয়ে চিরকাল অনন্ত রহমতের উৎস।

আঁ-হজরত স. এর বয়স সম্পর্কেও আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। এই ব্যাপারে কয়েকটি মতবাদের কথা বর্ণিত আছে। এক উক্তি অনুযায়ী ৬০ বৎসর, আর এক বর্ণনা অনুযায়ী ৬৩ বৎসর যাহা সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত এবং অন্য

এক সূত্র অনুযায়ী ৬৫ বৎসর। আলেম-ওলামাগণ এইসকল মতামতকে এমনভাবে সমন্বয় করিয়াছেন যে, যাঁহারা ৬৩ বৎসরের পক্ষে বলিয়াছে তাঁহারা বেলাদত (জন্ম) ও ওফাতের বৎসর গণনা করেন নাই এবং যাঁহারা ৬৫ বৎসর বলিয়াছেন, তাঁহারা বেলাদত ও ওফাতের বৎসরকেও হিসাবে ধরিয়াছেন। আর যাঁহারা ৬০ বৎসর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেবলমাত্র দশককে গ্রহণ করিয়া ভগ্নাংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

যাঁহারা সত্য পথের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী তাঁহাদিগকে সালাম।

হাজী শরীফের নিকট লিখিত।
মকতুব নং -১১

হজরত মুসা আলায়হিস সালাম সম্পর্কে কোরআন মজীদে বর্ণনা করা হইয়াছে "ফাখাফ ইন্না ইয়াকতা'লুন" অর্থাৎ "আমি ভয় করিতেছি যে ফেরাউনীগণ আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।" তাঁহার এই উক্তিতে তবলীগ (ধর্ম প্রচার) সম্পর্কে তিনি আপত্তি বা অসম্মতি (এনকার) প্রকাশ করেন নাই। বরঞ্চ ইহাতে তাঁহার সেই সময়ের অবস্থা বিশেষেরই বর্ণনা ছিল এবং এই ধরনের ইঙ্গিত ছিল যে, আমি নিহত হইলে আমার মাধ্যমে তবলীগের কাজ করা যে আর সম্ভব হইবে না। তবলীগের ব্যাপারে কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে তিনি এ কথা কেন বলিবেনঃ

"আমার জিহ্বার গ্রন্থি তুমি খুলিয়া দাও, যাহাতে মানুষ আমার কথা বুঝিতে পারে এবং আমার ভাই হারুনকে আমার সাহায্যকারী ও অংশীদার করিয়া দাও।"

টীকাঃ হাজী শরীফ, হজরত মোহাম্মদ মাসুম র. এর আদেশ পালনকারী সহচর এবং বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড)।

হাফেজ আবুল কাশেম বিন মোহাম্মদ মুরাদ লাহোরীর নিকট লিখিত। মকতুব নং–১২

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্য এবং তাঁহার রসুলের প্রতি দরূদ। তোমার লিখিত মর্যাদাবাহী মূল্যবান পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করিতেছি। ঐ পত্রে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রমজনিত দোষক্রটি এবং অতীত ও বর্তমানের অনুশোচনাকর ও দুঃখজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও তোমার পত্রে পরম আকাংখিতের সহিত মিলনের প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে– যে জন্য ঐ পত্র পাঠ করিয়া আনন্দের জোয়ারে হৃদয় খুশীতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা যেন আমাদের অনুভূতির সংকীর্ণতাবোধকে অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করার শক্তি প্রদান করেন। কল্পনাবিলাস ও অবাস্তবতা হইতে মুক্তি প্রদান করেন। আকাংখার আগুনকে অন্তরের মধ্যে প্রজ্বলিত করিয়া দেন। তাঁহার নৈকট্যলাভের পথে সমস্ত অন্তরায় ও বাধানিষেধ হইতে দূরে রাখেন এবং একাগ্রতা দান করেন। হৃদয়ের প্রেম ও প্রার্থনার মধ্যে সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্যকে এক ও একাগ্র করিয়া সেই একদিকেই প্রবাহিত করিয়া দেন। ইন্নাহা কারিবুম মুজিব–

এই নশ্বর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মকসুদ (উদ্দেশ্য) হইতেছে আল্লাহ্তায়ালার প্রকৃত পরিচয় (মারেফত) লাভ করা। মারেফত দুই রকমের ঃ–

(১) যে মারেফতের সম্পর্কে ওলামাগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন; এবং

(২) যে মারেফতের সঙ্গে সুফিগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

প্রথম প্রকারের মারেফত চোখে দেখা ও যুক্তি প্রমাণের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বিতীয় প্রকারের মারেফত ঐশী প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক জগতে আত্মনিমগ্নতার সহিত সম্পর্কযুক্ত। প্রথম প্রকার মারেফত জ্ঞানের পরিধির (দায়রায়ে এলেমের) মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাহা কেবল ধ্যান-ধারণার সহিত যুক্ত। আর দ্বিতীয় প্রকার মারেফত অবস্থার বিবর্তনের (দায়রায়ে হালের) সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। প্রথম প্রকারের মারেফত দৈহিক অস্তিত্বের পরিচয়কে (ওজুদে আরেফ) বিলীন করিয়া দিতে পারে না এবং দ্বিতীয় প্রকারের মারেফত ভক্তের সকল অস্তিত্বকে (ওজুদে সালেক) সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া দিতে সক্ষম হয়। প্রথমটি হইতে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়। দ্বিতীয়টি দ্বারা ভক্তের কামনা-বাসনার অস্তিত্বকে

ফানা (বিলীন) করিয়া নৈকট্যলাভের জ্ঞানের মাধ্যমে সত্যের সমাগম ঘটে। প্রথম প্রকারের গৃহীত মারেফত ভোগলালসাপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের প্রতিযোগিতায় এবং তাহাকে (ইন্দ্রিয়)অস্বীকার করার দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে– তাহা এই কারণে যে, ইন্দ্রিয় (নফস্) তাহার নিজস্ব পাপাচারের মধ্যে অবস্থান করে এবং অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কবল হইতে বাহিরে আসিতে পারে না। এই অবস্থায় ইমান থাকিলেও তাহা ইমানের আকৃতিস্বরূপ এবং পূর্ণ আমলসমূহ থাকিলে তাহাও কেবল আমলের আকৃতিস্বরূপ হইয়া থাকে, যাহা খাঁটি ইমান ও আমল নহে। ইহার কারণ এই যে, নফস্ সেখানে অবিশ্বাস ও ধোকার মধ্যে পতিত এবং আল্লাহ্তায়ালার বিরোধিতায় লিপ্ত রহিয়াছে। এই ধরনের ইমানকে নকল ইমান বা অপ্রকৃত ইমান (ইমানে মাজাযী) বলে। এই নকল ইমান বিশৃঙ্খলা ও পতনের হাত হইতে সুরক্ষিত নয়।

যেহেতু দ্বিতীয় রকমের মারেফত ভক্তের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া দেয় এবং নফসের প্রশান্তি আনয়ন করে, এইজন্য এই মঞ্জিলে ইমান যে কোন প্রকারের পতন হইতে সুরক্ষিত এবং বিশৃঙ্খলা হইতে নিরাপদ থাকে। প্রকৃত ইমানের স্থিতি এই মাকাম হইতে হইয়া থাকে এবং সত্যিকার খাঁটি আমলসমূহও এইখানে উজ্জ্বল আলোকমালার ন্যায় দ্যুতিময় হইয়া থাকে। প্রকৃত সত্য কখনও বাতিল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না– ইহার স্থায়িত্ব চিরন্তন হইয়া থাকে।

"ইয়া আইয়ুহাল লাজিনা আমানু আমেনু" অর্থাৎ হে ইমানদারগণ, (প্রকৃত) ইমান পয়দা কর– আল্লাহ্পাকের এই কালামে এই ইমানের প্রতিই ইশারা করা হইয়াছে। ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল র. এই মারেফতেরই অনুসন্ধানকারী ছিলেন, যে জন্য তিনি নিজে জ্ঞানী ও অন্যায় প্রতিরোধকারী হিসাবে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বিখ্যাত বুজুর্গ বেশার হাফি র. এর ঘোড়ার রেকাবের সাথে একজন খাদেমের মত চলিতেন। লোকে এই ধরনের আদব ও সম্মান প্রদর্শনের কারণ জানিতে চাহিলে ইমাম আহম্মদ র. বলিয়াছিলেন, আমার চেয়ে বেশার র. আল্লাহ্পাকের মারেফত অনেক বেশী হাসিল করিয়াছেন। ইমামে আজম রহমতুল্লাহ্ আলায়হি তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসরে মারেফতের এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রসিদ্ধ উক্তি হইতেছে "আমার মকসুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য যদি এই দুইটি বৎসর না আসিত তাহা হইলে নোমান ধ্বংস হইয়া যাইত।" ভাবিয়া দেখ, প্রথম হইতেই তিনি কত উচ্চ পর্যায়ের আমলের অধিকারী ছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করার মত আমলের নিকট আর কোন আমল সমকক্ষ হইতে পারে? শিক্ষাদান ও জ্ঞানদানের মত মহৎ আমলের সহিত আর কোন প্রকার ভক্তির তুলনা হইতে পারে? তাহা সত্ত্বেও তিনি তো সেই পূর্ণতার প্রতিই আসক্ত ও আনত হইয়াছিলেন।

জানা প্রয়োজন যে, পূর্ণ তরিকার মধ্যে গ্রহণযোগ্য আমলসমূহ (কবুলিয়াতে আমল) পরিপূর্ণ ইমানের অংশবিশেষ। আর নূরান্বিত আমলসমূহ (নূরানিয়াতে আমল) পূর্ণরূপে সমর্পিত আন্তরিকতা হইতেই সম্ভব হয়। ইমান ও আন্তরিকতা যত অধিক মাত্রায় পূর্ণতর হইবে আমলসমূহও তত বেশী নূরান্বিত ও গ্রহণযোগ্য হইবে। পরিপূর্ণ ইমান ও প্রকৃত আন্তরিকতার সঙ্গেই মারেফতের সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এই মারেফত অস্তিত্বকে বিলীন করার সহিত সম্পর্কযুক্ত। যে অকপটভাবে যত বেশী অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দিতে পারিবে সে ইমানে তত বেশী পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। এই কারণেই হজরত সিদ্দীকে আকবর (অর্থাৎ হজরত আবু বকর সিদ্দীক) রাদিআল্লাহুতায়ালা আনহুর ইমান সমস্ত উম্মতের ইমান অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ ছিল এবং অস্তিত্বকে বিলীন করার (ফানার) ক্ষেত্রে, পরিপূর্ণতা অর্জনকারীর দিক হইতে, তিনি সর্বাপেক্ষা সফলকাম ব্যক্তি (ফরদে কামেল) ছিলেন।

এই দীর্ঘ পত্রের সারবস্তু হইতেছে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোক তাহার অবশ্য কর্তব্য হিসাবে যেন আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে সাচ্চা দিলে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে। যে উপরিউক্ত মারেফত হাসিল করিতে পরিয়াছে সে মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। কারণ তাহাকে সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য ছিল সে তাহা পূর্ণ করিয়াছে এবং পরিপূর্ণ ইবাদতের সহিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছে।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করিয়াছেন, "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন" অর্থাৎ আমি জ্বিন ও ইনসানকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। এখানে ইবাদতের উদ্দেশ্য হইতেছে মারেফত। এই মারেফত যে হাসিল করিতে পারে নাই সে যেন সমস্ত মন প্রাণ দ্বারা ইহার সন্ধান লাভের চেষ্টায় রত থাকে এবং কোন স্থান হইতে ইহার সুঘ্রাণ পাইলেই সে যেন সেখানে গিয়া পৌঁছায়। আফসোস হয়, এই নশ্বর জীবনে যাহা বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয়, মানুষ তাহা হাসিল করার চেষ্টা করে না এবং অন্যান্য নানা অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে।

এই ধরনের মানুষ কাল কিয়ামতের দিনে কিভাবে তাহার ওজর আল্লাহ্‌পাকের নিকট পেশ করিবে?

সে যে আমায় চেনে ওগো, সব কিছু মোর জানে,
কি করি আর কোথায় থাকি সব খবরই রাখে,
চেনে-জানে বলে যে গো ভয় তো আমার সেই খানে,
থাকত না যে দুঃখ কোন না চিনিলে এই আমাকে।

হাজী মোস্তফার নিকট লিখিত।
মকতুব নং–১৩

তুমি কিছু সাংসারিক জড়বস্তু হাসিল না হওয়া সম্পর্কে লিখিয়াছ। আল্লাহ্তায়ালা যাহা কিছু করেন সব মঙ্গলের জন্য। সমস্ত জীবনটাকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট সমর্পণ করিয়া দাও। সাংসারিক বিষয়বস্তু অর্জন করার ব্যাপারে অনর্থক পরিশ্রম করিও না। "আলাই সাল্লাহু বিকাফীন আবদুহু"– আল্লাহ্তায়ালা কি তাঁহার বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নহেন? স্মরণ রাখিও, আমাদের সম্মান ও ইজ্জত, ইমান ও মারেফতের সহিত সম্পর্কিত– ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার সহিত নয়। ইমানের পূর্ণতা অর্জন করার জন্য অবিরত চেষ্টা কর এবং ধাপে ধাপে মারেফতের উচ্চ স্তরসমূহ হাসিল করার জন্য সর্বাত্মকভাবে সংগ্রাম করিয়া যাও। এই মহান মর্যাদার উদ্দেশ্যে তুমি যে পরিমাণ ত্যাগ ও পরিশ্রম করিতে পারিবে তাহাই হইবে সুন্দর ও প্রশংসনীয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত দুঃখকষ্টকে মাত্র একটি দুঃখকষ্টে পরিণত করে অর্থাৎ কেবলমাত্র আখেরাতের দুঃখকষ্টের মধ্যে তাহা কেন্দ্রীভূত থাকে তখন আল্লাহ্তায়ালা তাহার সকল দুঃখকষ্ট বিদূরিত করিয়া থাকেন।

টীকাঃ হাজী মোস্তফা হজরত উরওয়াতুল উসকা খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। বাংলায় তাঁহার কবুলিয়ত নামা হাসিল হইয়াছিল, রওজাতুল কাইয়ুমিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহাকে হাজী মোস্তফা বাঙ্গালী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

শায়েখ আরবের নিকট
লিখিত। মকতুব নং–১৪

আমলের হিসাবে যাহার দুইটি দিন একইভাবে অতিবাহিত হয় অর্থাৎ আগের দিনের তুলনায় পরের দিনে দ্বীনি আমলে যে অধিক তরক্কি করিতে পারে না সে ক্ষতির মধ্যে থাকে। তোমার সময়কে তুমি নিত্যদিনের প্রার্থনাসমূহের (অজিফাসমূহের) এবং ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে নিয়োজিত রাখ। অবকাশের সময় খুব কম, সেই সময়টুকুও বাতেনকে সুগঠিত এবং কলবকে নূরান্বিত করার কাজে লাগাও। কেবল বাহিরকে (জাহেরকে) সুসজ্জিত ও সুগঠিত করা যেমন ভিতরের (বাতেনের) জন্য ক্ষতির কারণস্বরূপ তেমনি বাহিরের (জাহেরের) প্রতি বেখেয়াল ও উদাস থাকাও ভিতরের জন্য (বাতেনের) ক্ষতির কারণস্বরূপ। কেননা জাহের এবং বাতেন একে অপরের পরিপূরক। আর আমরা জাগতিক কামনা বাসনা ও উচ্চ আকাংখার জন্য কেবল জাহেরকে সুসজ্জিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার পিছনে লাগিয়া থাকি। বাতেনের প্রতি এই উদাসীনতায় অভ্যন্তরের অবক্ষয় সম্পর্কে আমরা আর কতটুকু খোঁজ খবর রাখিতে পারি।

টীকাঃ শায়েখ আরব, শায়েখ নূর র. এর ফরজন্দ আখুন দরওয়িজা র. এর খলিফা শায়েখ আদম বন্নুবী র. এর খাস্ মুরিদ ছিলেন। সকাল সন্ধ্যা হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর মকতুবাত শরীফের অধ্যয়নে মশগুল থাকিতেন। তারিখে মোহাম্মদী গ্রন্থে ১০৯৬ হিজরীতে আরব শেখ নামক এক ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহার সম্পর্ক ঐ গ্রন্থে বলা হইয়াছে– আরব শেখ (যিনি মুগল খান নামে সমধিক পরিচিত) ইবনে তাহের খান বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বকালে মালুহতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকা অবস্থায় ১০৯৬ হিজরীর ২২শে শাবান ইন্তেকাল করেন। মায়াসারুল উমরা গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আরব শেখ নামে এই আমীরের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহার সংক্ষিপ্তসার হইতেছে– মুগল খান আরব শেখ হইলেন তাহের খান বলখীর পুত্র। মুগল খান তাঁহার উপাধি ছিল। তিনি বাদশাহ আলমগীরের রাজত্বকালে উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী (মনসবদার) ছিলেন এবং চাকুরীতে ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মালুহ প্রদেশের শাসনকর্তা (সুবাহদার) হইয়াছিলেন এবং তিন হাজারী মনসব এবং সাড়ে তিন হাজারী অশ্বারোহী দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১০৯৬ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

হাফেজ মোহাম্মদ মহসীন দেহলবী
র.-এর নিকট লিখিত। মকতুব নং-১৫

মহান আল্লাহ্তায়ালার প্রতি যাবতীয় প্রশংসা ও নবী করিম স. এর প্রতি দরূদসমূহ এবং তবলীগের দাওয়াতের পর জানাইতেছি যে, তোমার সুন্দর পত্রখানি যাহা তুমি এই মিসকিনের নামে অত্যন্ত মহব্বতের সহিত প্রেরণ করিয়াছ তাহা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। পত্রখানি উচ্চ মরতবাপূর্ণ, গুণে এবং সুন্নতের স্বাদে-গন্ধে ভরপুর ছিল, যে জন্য তাহা আনন্দের উপর আরও অধিক আনন্দ প্রদান করিয়া চিত্ত জয় করিয়াছে।

তুমি লিখিয়াছ, কখনও কখনও এমন একটি সংযোগের (নেসবতের) আবির্ভাব ঘটে যাহা হইতে কেবল নূর প্রকাশ পাইতে থাকে এবং নিজেকে তুমি সেই নূরের মধ্যে হারাইয়া ফেল। এই নেসবতের নাম যে কি হইতে পারে তাহা তোমার ধারণায় আসে না। ইহার উপর সেই নূরের পরিচয় ও তাহার প্রকৃত তত্ত্ব (হকীকত) জানা না থাকার জন্য তোমার অজ্ঞতার কারণে, সে বিষয়ে কিছু বর্ণনা করিতে ও ভাষায় প্রকাশ করিতে তুমি অক্ষম। এমন কি কোন কিছুর সহিত তুলনা করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়। এই উচ্চ মরতবাসম্পন্ন পবিত্র নূরের আবির্ভাবে বিনয়ের সহিত আশ্চর্য হওয়া ছাড়া তুমি আর কিছুই অনুভব করিতে পার না।

টীকাঃ হাফেজ মোহাম্মদ মহসীন দেহলবী ছিলেন শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী র. এর পুত্র। তিনি হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর উচ্চস্তরের খলিফা ছিলেন এবং ধর্মীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতি বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সমসাময়িককালে তিনি দিল্লীর সমস্ত আলেম-ওলামাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হজরত নূর মোহাম্মদ বদায়ুনি র. এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর ফয়েজ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১১৪৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। দিল্লীতে শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী র. এর মাজারের পশ্চিম দিকের এক চত্বরে (চবুতরায়) তাঁহার মাজার অবস্থিত (তাজকেরায়ে উলামায়ে হিন্দ ও মাজারতে আওলিয়া দিল্লী)।

হে সম্মানীয়! হজরত মোজাদ্দেদ সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু আনুগত্যের স্তরসমূহেরও ঊর্ধ্বে আরও একটি উচ্চস্তর সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাকে অবিমিশ্র নূর (নূর-ই-সিরফ) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এমন কি ইহাকে কাবার মলূতত্ত্ব ও দর্শন (হকীকতে কাবা) হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি যাহা অনুভব করিতেছ তাহা যদি ঐ ধরনের হকীকত প্রকৃতির হয়, যে সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদ র. বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে পরম সৌভাগ্যের বিষয়– এমন কি তাহার ছায়াও যদি হয় তবুও তাহা আল্লাহ্‌র দান ও আশীর্বাদস্বরূপ। বস্তুত যাহা কিছু হউক, উহা সৌভাগ্যজাত বিশিষ্ট উজ্জ্বল বর্ণের। এই নেসবতের বিশুদ্ধতা ও উচ্চতার কারণেই তুমি যেমন লিখিয়াছ তদ্রূপ ঘটে, যেমন প্রায় নামাজের সময় এই নেসবতের উপস্থিতি ঘটে, বিশেষ করিয়া ফরজ নামাজ আদায় করিবার সময় এবং নামাজের পরেও যতক্ষণ পর্যন্ত জামাতের স্থানে বসিয়া থাক ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ধরনের অবস্থা বর্তমান থাকে, তাহার পর অদৃশ্য হইয়া যায়।

হে সম্মানীয়। নামাজ হইতেছে মোমেনের জন্য মিরাজ এবং হালত (অবস্থা) হইতেছে মিরাজের নমুনাস্বরূপ। সিজদাকারী আল্লাহ্‌তায়ালার মোবারক কদমের উপর সিজদা করে– এই হাদীস তুমি শুনিয়া থাকিবে। হাদীসে আরও আছে, বান্দা যখন নামাজে রত হয়, আল্লাহ্‌তায়ালা তখন তাহার দিকে মনোযোগ প্রদান করেন। আবার ফরজ নামাজের বৈশিষ্ট্য (অন্য নামাজের তুলনায়) স্বতন্ত্র। তাহার উপর জামাতের সঙ্গে নামাজ যাহা কেবল উচ্চমর্যাদাবাহী নূরের উপর নূর দ্বারা ভরপুর। রসুলুল্লাহ স. বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ সমস্ত লোকদিগকে নূরের আলো দ্বারা আলোকিত করিয়া দিবেন, যাহারা অন্ধকারে মসজিদে যাইত।

তুমি লিখিয়াছ যে, কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করার মধ্যে যে উন্নতি সাধিত হয়, তাহা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে খুব কম। বিশেষ করিয়া ঐ ধরনের তেলাওয়াত যাহা নামাজের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া করা হয়। হাঁ, এই উন্নতি তেলাওয়াত এবং নামাজ উভয়ের সংযুক্ত ফল। কোরআনের পাক কালাম হইতেছে মূলতত্ত্ব সমূহের গুণাবলী যাহা নিজ অস্তিত্বের প্রশংসা হইতে কোন সময় বিচ্ছিন্ন হয় না। এই গুণাবলীর সহিত সম্পর্ক রাখার অর্থ হইতেছে গুণাবলীর প্রশংসা হইতে পূর্ণতাকামী নৈকট্য লাভের উপায়।

ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ বাকের ফতেহ্ আবাদীর নিকট লিখিত। মকতুব নং– ১৬

তুমি জানিতে চাহিয়াছ, যে সঠিক পথে মহৎ পুণ্যাত্মাগণ প্রকৃত ইশকের অধিকারী হইয়া থাকেন তাহা কি দৃষ্টির পথ হইতে প্রাপ্ত, নাকি জানার পথ হইতে তাহা প্রাপ্ত। ইহার জবাব হইতেছে দৃষ্টির পথ হইতে নয়, কারণ দীদারের ওয়াদা তো আখেরাতের জন্য করা হইয়াছে, ইহার প্রাপ্তিযোগ শোনা ও জানার পথে।

প্রেমের জোয়ার একা একা কভু কাছে তো আসে না
তার দেখা পেলেও, যদিনা দেখে সে তোমায়
অথবা ভালবাসে না,
তাহলে ধন দৌলত ব্যর্থ সব, মিথ্যা সাজসজ্জা
আলাপে আলাপে যদি চার চোখের মিলন
হৃদয়ে না পাতে শয্যা।

তুমি আরও জানিতে চাহিয়াছ যে, ইশক্ যদি জানার পথ হইতে পাওয়া যায় তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালা যে ভাবে তাঁহার নাম ও গুণাবলীর সহিত চির-বর্তমান, আমরা তো ঠিক সেইভাবে তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছি তবু জানা ও চেনা সত্ত্বেও কি কারণে অপ্রকৃত (নকল) ইশকের মত আমাদের মধ্যে অস্থিরতা ও আরামহীন অবস্থার প্রকাশ থাকে না এবং কেনই বা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ঐ রকম আকাংখার আগুন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না।

টীকাঃ আজম খান মীর মোহাম্মদ বাকের ওরফে এবাদত খান হজরত আলী রা. ও হজরত ফাতেমা রা. এর বংশধর ছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এবং পরে বাদশাহ্ শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। বাদশাহ্ শাহজাহান যখন বোরহানপুর আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে খান জাঁহা লোদীর মোকাবিলা করিবার জন্য এবং নিজামশাহীর রাজত্ব দখল করিবার জন্য হুকুম দেন। তিনি এই দুইটি কাজই অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। তিনি দহারোর কেল্লা জয় করিয়া তাহার ফতেহাবাদ নাম রাখেন (সম্ভবতঃ এই কারণেই তাঁহাকে ফতেহাবাদী বলা হইত)। অবশেষে জৈনপুরের শাসনভারও তাঁহার উপর সমর্পণ করা হয়। সেখানে ১০৫৯ হিজরীতে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। জৈনপুরের সমুদ্রের ধারে তিনি একটি বাগান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন– সেখানেই তাঁহার দাফন সম্পন্ন করা হইয়াছে।

জবাব এই যে, ইহার কারণ দুইটি। প্রথম কারণ হইতেছে, কেবলমাত্র জানার বিষয় কখনও ইশকের হেতু হইতে পারে না। শুধু জানা শোনার ব্যাপার যদি ইশকের জন্য যথেষ্ট হইত তাহা হইলে তামাম মুসলমান আশেক ও প্রেমিক হইত এবং আপনাপন অস্তিত্ব ও অজ্ঞতা হইতে বিলকুল মুক্ত হইয়া যাইত, কেননা এই সব জিনিসই সেখানে ইশকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হইত। বস্তুত ইশ্‌ক এবং হৃদয়ের বন্ধন (গেরেফতারী দিল) হইতেছে জান্নাতী উপহার বিশেষ। যদিও এই ইশকের স্তর ও বিন্যাস জানার মাধ্যমে আসিয়া থাকে তবুও পার্থিব জগতে এই ইশ্‌ক সঠিক রীতিনীতি ও আধ্যাত্মিক সাধনার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং সেই সাথে এমন কামেল পীরের সহবত প্রয়োজন যিনি বিশেষ অনুভূতি ও পদ্ধতিসম্পন্ন পথসমূহের (সুলুক ও জজবার) পরিভ্রমণ পূর্ণতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা সেই মারেফত যাহার সহিত সূফিয়ায়ে কেরামগণ প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন, যাহা এই ধরনের ইশ্‌ক ও আশার ফলশ্রুতি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, যে ইশ্‌ক ক্রমশঃ অস্থিরতার সহিত সম্পর্কিত তাহাতে নিরানন্দ ভাব থাকে এবং তাহা অভ্যন্তরীণ অবস্থার (বাতেনের) অংশ বিশেষ। প্রকাশ্যে তাহার অনুপ্রবেশ খুব কম পরিলক্ষিত হয়, কেননা ব্যাকুলতার প্রকাশমান অবস্থা ইশ্‌কে ব্যাকুলতার সম্পূর্ণ খেলাফ বা পরিপন্থী। ইহার বিপরীতে অপ্রকৃত ইশ্‌কে (যে ইশ্‌ক সঠিক ও আসল নয়) কিছুটা অনুরূপ অবস্থার সহিত সম্পর্ক থাকিলেও তাহা কেবল বাহিরের অংশস্বরূপ এবং তাহার প্রভাবও বাহ্যিকভাবে অধিক হইয়া থাকে; যেমন অস্থিরতা, হা হুতাশ, চিৎকার ইহ্যাদি। প্রকৃত ইশ্‌কে (ইশ্‌কে হকীকী) কোন মত্ততা থাকে না এবং নকল ইশ্‌কে (ইশ্‌কে মাজাযী) যে প্রভাবসমূহ থাকে তাহা প্রকৃত ইশ্‌কের মধ্যে কম পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত ইশ্‌কের পরিচয় প্রেমিকের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কিছু হইতে নিজেকে মুক্ত করার মধ্যে নিহিত আছে। ইহাই আসল ইশ্‌ক। আর নকল ইশ্‌ক হইতেছে ইশ্‌কের খোলসস্বরূপ। আসল কথা হইতেছে, নকল ইশ্‌কের মধ্যে যেমন প্রেমিক প্রেমাস্পদের মধ্যে পারস্পরিক আকৃতির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তেমনি তাহার প্রভাবও বাহ্যিক আকৃতির মধ্যে অধিক প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত ইশ্‌কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আকৃতির সম্পর্ক বিলুপ্ত থাকে, সুতরাং প্রকাশ্যে তাহার প্রভাবও কম পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত ইশ্‌ক অস্তিত্বের বিলুপ্তি সাধনের পর স্থায়িত্ব ও অমরত্ব (ফানা ও বাকা) প্রাপ্ত হয় যাহা অভ্যন্তরীণ গোপন অবস্থার সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত।

তবে হ্যাঁ, প্রতিবিম্বের মধ্যে অবস্থানকালে (মাকামাতে যিল্) প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রভাব প্রকাশ্যভাবে পরিলক্ষিত হওয়ার কারণ থাকিতে পারে।

এই কারণে সত্যিকার ইশ্কের মধ্যেও কখনও কখনও চীৎকার, আহ্বান, আর্তনাদ ইত্যাদি পাওয়া যায়। আবার অবস্থা যখন এই প্রতিবিম্বের পর্যায়কে অতিক্রম করিয়া আরও উপরে উন্নীত হয় এবং অদৃশ্য হইতে আরও গভীর অদৃশ্যলোকের দিকে (গায়েবুল গায়েবের দিকে) হৃদয়ের কথাবার্তা পৌঁছাইতে থাকে, তখন সেই অবস্থায় ব্যাকুলতা, নিরানন্দভাব ইত্যাদি কম হইয়া যায়। সুতরাং নবুয়তের পরিপূর্ণতার (কামালাতে নবুয়ত) মধ্যে যে মাকামের অবস্থিতি সেখানে কেবল মহব্বত অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকারের এরাদা বিদ্যমান থাকে এবং কোন রকম অস্থিরতা ও নিরানন্দভাব আর তাহার মধ্যে থাকে না। এই মহব্বত এমন ধরনের হয় যেরূপ প্রত্যেকের মহব্বত থাকে তাহার নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে। বরং তাহা অপেক্ষা আরও অধিক নাজুক ও আনন্দদায়ক। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, নিজের অস্তিত্বের চেয়ে প্রিয়, দৃশ্যতঃ আর কিছুই নাই– ইল্লা মাশা আল্লাহ– তথাপি এই সিলসিলায় কোন উন্মাদনা ও অস্থিরতা পাওয়া যায় না।

তুমি লিখিয়াছ, আল্লাহ্পাকের ইবাদত করার যে তৌফিক তুমি পাইয়াছ তাহাতে নিজেকে তুমি অত্যন্ত অপরাধী ও অসহায় হিসাবে পাইয়া থাক এবং আখেরাতের কাজ আনজাম দেওয়ার মত আধ্যাত্মিক শক্তিও খুব কম দেখিতেছ।

তুমি এই সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছ তাহা অবিকল এই ফকিরের অবস্থারই বর্ণনা। আমি নিজে আর আমার অক্ষমতা সম্পর্কে তোমার নিকট কি প্রকাশ করিব। এই অপদার্থের নিকট হইতে তাহার নিরাময় চাওয়া যেন কর্জ প্রার্থনাকারীর নিকট হইতে কর্জ চাওয়া অথবা কোন মুখাপেক্ষী ও কপর্দকহীনের নিকট হইতে কিছু অনুসন্ধান করার সামিল। এখানে তো চিকিৎসক নিজেই অসুস্থ। আল্লাহ্তায়ালা যেন আমাকে এবং তোমাকে তাঁহার পছন্দ অনুযায়ী চলার মত তওফিক দান করেন এবং পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে যেন তিনি আমাদের পথ প্রদর্শক হন এবং দেখাশোনা করেন। ওয়াস্ সালাম।

শায়েখ মোজাফফরের নিকট
লিখিত। মকতুব নং–১৭

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস্ সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্তাফা।

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার সাক্ষাতের বাসনা প্রকাশ করিয়াছ। এই দিকে তোমার নিজের সাক্ষাতের ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা ও আকাংখা রাখিও। মনে প্রাণে সুন্নতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিও।

দ্বীন ও দুনিয়ার সরদার আলায়হি ওয়াসসালাতু ওয়াসসাল্লামের আদত (অভ্যাসসমূহ) ও ইবাদতের সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুরূপ সাদৃশ্য বজায় রাখিয়া সেইগুলিকে অনুসরণ করাকে উচ্চ মর্যাদাবহনকারী সৌভাগ্য বলিয়া জানিবে। ইহা প্রাচুর্যময় সৌভাগ্যের চাবিকাঠি যাহা উত্তরোত্তর উচ্চ মর্যাদার দিকে শুভ পরিণামের ফলস্বরূপ। বন্ধুর (মাহবুবের) মনোরম আকৃতি ও চেহারায় যে নিজেকে অংকিত ও সজ্জিত করিয়া লইতে পারে সে নিজেই বাঞ্ছিত বন্ধু হইয়া যায়। কালামপাকের এই আয়াত ইহার সাক্ষীস্বরূপ– কুল ইন্ কুনতুম্ তুহিব্বুনাল্লহা ফাত্তাবিঊনী ইউহ্বিব কুমুল্লাহ্। হে বন্ধু, আপনি বলিয়া দিন, ওহে মানব সকল, তোমরা যদি আল্লাহ্তায়ালার সহিত মহব্বত করিতে চাও তাহা হইলে আমার আনুগত্য কর, (এই আনুগত্যের বরকতে) আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের সহিত মহব্বত করিতে থাকিবেন (এবং তোমরা উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়া আল্লাহ্তায়ালার বন্ধু হইয়া যাইবে।

নিজ সময়কে সর্বদা সৎ আমল দ্বারা পরিপূর্ণ রাখিবে। দীর্ঘ সুরা কেরাত দ্বারা নামাজ আদায় করিবে আর তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রিকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা আলোকময় করিয়া তুলিবে। কলেমা তাইয়্যেবার জিকির এমনভাবে করিবে যাহাতে আল্লাহ্পাকের বাসনা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বাসনা হইতে তোমার হৃদয় শূন্য হইয়া যায়। ওয়াস্ সালাম।

শায়েখ বাইজীদ সাহারানপুরীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-১৮

(বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব সম্পন্ন করিবার এরাদা করিয়া সফরের উদ্দেশ্যে এই মকতুব লিখিত হইয়াছে।)

আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে কেবলমাত্র তাঁহার দাসত্ব ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন এবং তোমার অন্তরকে তাঁহার মূল অনুভূতির আস্বাদে পরিপূর্ণ রাখেন। তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আশা করিতেছি জিলক্বদ মাসের শেষদিকে ২০ তারিখ হইতে ২৯ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন হজ্বের উদ্দেশ্যে সেরহিন্দ হইতে রওয়ানা হইব এবং সুরাট বন্দর হইতে চির-আকাংখিত কাবায় হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিব।

এইতো মাধ্যম তাঁকে চাওয়ার পাওয়ার
যতখুশী চাও তুমি, অফুরন্ত ভাণ্ডার।

বস্তুবাদী জ্ঞানের প্রতি বুদ্ধিকে নিয়োজিত রাখিলে তাহা বস্তুর প্রতি শৃঙ্খলিত হইয়া পড়ে। তাই আল্লাহ্‌র ইশকের পথে জ্ঞান বুদ্ধির বন্ধন হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে এবং নিজের সমগ্র দৃষ্টিকে যিনি যাবতীয় বস্তুর মালিক তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। কবি কি সুন্দর ভাবেই না বলিয়াছেন–

টীকাঃ শায়েখ বাইজীদ সাহারানপুরী ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর খলিফা শায়েখ বদীউদ্দীন আনসারী সাহারানপুরীর সাহেবজাদা। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করার পরে সেরহিন্দ চলিয়া আসেন। সেখানে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর নিকট বয়াত হন এবং তরিকার জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকিয়া প্রভূত রূহানী ফয়েজ হাসিল করেন। হজরত খাজা সেরহিন্দী র. পরে তাঁহাকে খেলাফত দান করেন। তিনি সেরহিন্দ হইতে সাহারানপুর চলিয়া আসেন এবং সেখানে আদেশসমূহ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে মসনদে আসীন হন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে বহু বিষয়ে মীমাংসা লাভ করেন। তিনি অল্পে তুষ্ট থাকিতেন এবং সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার উপর সমর্পিত-প্রাণ ছিলেন। ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষাদান এবং পরোপকারে তিনি মশগুল থাকিতেন। ১১০০ হিজরীর সোমবারে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার কবর সাহারানপুরে অবস্থিত।

হৃদয়কে বেঁধে রাখো লাইলীর চুলের লহরে
কাজ কর নির্দ্বিধায় মজনুর জ্ঞান বুদ্ধি ধরে;
মনে রেখো এই পথে জ্ঞানীদের সারগর্ভ বাণী–
প্রেমিকের তরে শুধু ক্ষতির কারণ আনে টানি।

যে স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ, তাহা খুবই উত্তম। যে সমস্ত কাজের অপেক্ষায় আশান্বিত হইয়া আছ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা যেন তাহা বাস্তবে পরিণত করেন। তোমার হৃদয়কে তাঁহার সন্ধানের পথে যেন তিনি আরও অধিক আবেগ ও উষ্ণতা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাবৎ বিষয়বস্তু হইতে তিনি তোমাকে মুক্তি প্রদান করেন– ইন্নাহা কারিবুম মুজিব। কোন এক বুজুর্গ বলিয়াছেন, তাসাওফ অস্থিরতার নামান্তর। যখন পরিপূর্ণ শান্তি আসে তখন কোন তাসাওফ থাকে না। মুরিদকে সেই রকম গুণসম্পন্ন হইতে হইবে যাহা এই আয়াতে করিমে বর্ণনা করা হইয়াছে– হাত্তা ইজা যোয়াক্বাত আলায়হিমুল আরযু বিমারাহুবাত ওয়া যোয়াক্বাত আলায়হিম আনফুসুহুম ওয়া যোয়ান্নু আল্লা মাদ্জাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলায়হি (সূর তওবা)

“যে পর্যন্ত না বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও জমিন তাহাদের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিসহ হইয়াছিল এবং তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এখন আর কোন আশ্রয়স্থল নাই, কেবল মাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত।”

এখন আমি তোমাকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করিতেছি– তুমিও আমাকে তাঁহার নিকট সোপর্দ করিয়া দাও। শান্তি ও কল্যাণের জন্য শেষ পর্যন্ত দোয়ার সহিত স্মরণ রাখিও।

তবু যদি বেঁচে থাকতে হয় আমাকে
এই দগ্ধ পৃথিবীর বুকে
বিরহী হয়েই থাকব আমি আমরণ,
বিরহের গন্ধ শুঁকে শুঁকে।
যে আশায় আমি নিজ হতে এতদিন
চেয়েছিনু বাঁচিয়া থাকিতে
মাটি হয়ে গেছে হায় আশার গৌরব
পারি নাই ধরিয়া রাখিতে।

ওয়াস্সালাম।

সিলসিলাভুক্ত জনৈক পর্দানশীন মহিলার নিকট লিখিত। মকতুব নং–১৯

(সমবেদনা ও উপদেশ আকারে)

সম্মানীয়া পুণ্যবতী ভগ্নীকে জানাইতেছি যে, হৃদয়বিদারক খবর (সম্ভবতঃ উক্ত মহিলার স্বামীর মৃত্যুর খবর) শ্রবণ করার পর যে আঘাত পাইয়াছি, তাহা পত্রে আর কি বলিব। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা এই রকমই ছিল, সেই জন্য ধৈর্য ও সহনশীলতা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই এবং তাঁহার নিকট নিজেকে সমর্পণ করা ও তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করা ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজিঊন। দুনিয়া তোমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে– আল্লাহ্তায়ালা যেন তোমাকে আখেরাত ও নিজ মহব্বত দান করেন, তাঁহার বন্ধুত্বের পরিচয় প্রদান করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় বন্ধু হইতে তোমাকে মুক্তি প্রদান করেন।

সময়কে আল্লাহ্পাকের স্মরণে পরিপূর্ণ রাখিবে এবং যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে দোয়া ও ইসালে-সওয়াবের মাধ্যমে স্মরণ রাখিবে। আজ হউক কাল হউক আমাদিগকেও এই জামাতের সহিত একদিন একত্রিত হইতে হইবে, আপন পরিবার পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে এবং নিজ সন্তান সন্ততি ও সমস্ত প্রকার আনন্দ উল্লাস হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই আখেরাতের জিনিস ঠিক করিয়া লও এবং কবর ও কেয়ামতকে ঠিকঠাক মত প্রতিষ্ঠিত কর।

আল্লাহ্তায়ালা যেন তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং জাহের ও বাতেনের জন্য অখণ্ড একাগ্রতা দ্বারা স্বীয় অনুগ্রহ প্রদান করেন।

ইন্নাহু ক্বারিবুম্ মুজিব।

মীরক মঈনউদ্দীনের নিকট
লিখিত। মকতুব নং–২০

আলহামদুলিল্লাহি জাল্ জালালে ওয়াল্ একরাম ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আ'লা রসুলিহী সাইয়েদিনা ওয়াআ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

তোমার মূল্যবান পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রীত হইয়াছি। পত্রখানি অন্তরের আকাংখা ও সন্ধানের ঐকান্তিকতায় পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া আরও অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি। আল্লাহ্তায়ালা ঐ আকাংখার আগুনকে যেন প্রজ্বলিত রাখেন, প্রার্থনার শিখাকে যেন সদা উন্নত রাখেন এবং ঈপ্সিত খুশবু যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আত্মার মর্মমূলে পৌঁছাইয়া দেন।

ইশকের আগুন যখন জ্বলে উঠে দাউ দাউ
অন্তরে বাহিরে সারা সত্তাজুড়ি,
তার অন্তহীন তেজে জ্বলে পুড়ে ছার খার সব,
থেকে যায় প্রেমিক কেবল অন্তরাত্মা জুড়ি।

যে পরিমাণ আকাংখা ও সন্ধানের আগ্রহ থাকুক না কেন তাহাই আশীর্বাদ ও আশার আধারস্বরূপ।

টীকাঃ মায়সারুল উমরা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রায় দশ পৃষ্ঠাব্যাপী বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে মীরক মঈনউদ্দীন সম্পর্কে। তাঁহার মহত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনার শুরুতে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

খান আমরযশ নিশান মীরক মঈনউদ্দীন আহমদ আমানত খান খোয়াফী ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির সত্যবাদী ও ধর্মভীরু ব্যক্তি। তিনি ধর্মীয় আইন কানুনের শুদ্ধতা ও তাহার যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের ও দিব্যচক্ষুর অধিকারী ছিলেন। তিনি ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত উদার প্রকৃতির খাঁটি মানুষ, সেই সঙ্গে ফেরেশতা স্বভাবসম্পন্ন পবিত্র সকলের সুখদুঃখে একাত্ম, নম্র ও বিনয়ী, মানবতাবোধসম্পন্ন, অত্যন্ত দানশীল, মহৎ, বন্ধু বৎসল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। সুবিচারক, মুক্ত মনের অধিকারী, আমানতদার, সৎ পরামর্শ দাতা, চিন্তাবিদ, সর্বসাধারণের হিতাকাংখী, বিদ্বেষ বিরোধী এবং দয়ার্দ্রচিত্ততার জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তাঁহার পরিচিতি সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আরও যাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

এই পত্রে অদৃশ্যলোকের সংযোগ (নেসবত) লাভ করার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে। দেখ, সতত অনুসন্ধানে রত প্রেমিকের জন্য যাহা জরুরী, তাহা হইতেছে, অনুসন্ধানের ব্যাকুলতা এবং প্রার্থনার উপাদান যাহা কিছু তাহার মধ্যে থাকুক না কেন, অকপটভাবে তাহা কেবল স্বীয় শায়েখের নিকট ব্যক্ত করা। কিন্তু তরিকার পথে কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা নিরূপণ করার ভার সম্পূর্ণরূপে মোর্শেদের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। রোগী কেবলমাত্র নিজের রোগ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট ব্যক্ত করিবে। কিন্তু নিজে রোগী হইয়া রোগের পদ্ধতি নির্ণয় করা এবং সেই রোগের চিকিৎসা কিভাবে করা হইবে সে সম্পর্কে কিছু বলা অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। পারিশ্রমিক ও প্রাপ্তির স্থায়ীত্ব শায়েখের সহবতের মধ্যে নিহিত থাকে।

দেখ, একজন সত্যিকার প্রেমিক নিজ যোগ্যতা ও মহব্বত অনুযায়ী কোন কামেল মোর্শেদের বাতেন হইতে প্রভূত ফয়েজ ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে সে সমস্ত প্রকার পাপ ও হীনতা হইতে শূন্য হইয়া কামেল মোর্শেদের রংয়ে রঞ্জিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। বুজুর্গগণ বলিয়াছেন, শায়েখের মাঝে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দেওয়ার (ফানা ফিশ শায়েখের) মধ্যেই আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের সঙ্গে নিজ অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দেওয়ার (ফানাফিল্লাহর) প্রাথমিক স্তর নিহিত আছে। শায়েখের সঙ্গলাভের (সহবতের) সৌভাগ্য যদি না হয় তথাপি কেবলমাত্র আন্তরিক মহব্বতের মাধ্যমে শায়েখের তাওয়াজ্জোহ্ দ্বারা কার্যকর ভাবে ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায়। কিন্তু শায়েখের সঙ্গলাভ করা ও সঙ্গলাভ না করিতে পারার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে।

তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ বলদাহ্ হিরাতের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার স্বনামধন্য প্রপিতামহ মীর হোসেন খোয়াফ শহরে আসিয়াছিলেন। মীর হোসেনের পুত্র মীরক কামাল তাঁহার সন্তান মীরক হুসাইনের সঙ্গে বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুস্তান আগমন করেন। মীরক হুসাইন জান্নাত মকানী বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ্ শাহজাহানের রাজত্বকালে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পরে রাষ্ট্রদূতের মর্যাদায় তাঁহাকে বলখের শাসনকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। মীরক মঈনউদ্দীন এই মীরক হুসাইনের পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে তিনি উঠতি বয়সের যুবক ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি বাদশাহের নিকট হইতে চাকুরী লাভ করিতে সমর্থ হন। ১০৫০ হিজরীতে শাহজাহানের রাজত্বকালে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে ও ইতিহাস লেখক হিসাবে আজমীর প্রদেশের কাজ তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হয়। পরে তিনি দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান।

শেখ মারুফ ভিকরী কর্তৃক ১০৬০ হিজরীতে রচিত সংকলন গ্রন্থ জাখিরাতুল খওয়ানিন গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে যে, মীরক হুসাইন খোয়াফীর পুত্র মীরক মঈনউদ্দীন তাহার পূর্বপুরুষগণ অপেক্ষা মর্যাদা ও আভিজাত্যের ক্ষেত্রে আরও অধিক গৌরব ও কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। যৌবনকালেই মীরক মঈনউদ্দীন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং সুন্দর হস্তলিপির জন্য খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালের ২৮ বৎসরে কান্দাহার যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দারাশিকোর সঙ্গী হিসাবে মনোনীত করা হয়।

দেখ, হজরত ওয়াস্ করনী র. যদিও আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বাতেন মোবারক হইতে লাভবান হইয়াছিলেন এবং অতি শীর্ষ শ্রেণীভুক্ত হিসাবে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনি সাহাবাগণের সমপর্যায়ে পৌঁছাইতে পারেন নাই। অবশ্য তাবেঈন শ্রেণীভুক্ত তিনি নিশ্চয় হইয়াছিলেন। এই ফকিরের সহিত তোমার যে মহব্বত আছে তাহাকে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হিসাবে মনে করিবে এবং এই ঐশ্বর্য (দৌলত) যাহাতে দিন দিন আরও বৃদ্ধি পায় সেই ফিকিরে রত থাকিবে। প্রত্যেক ব্যক্তির হাশর তাহার সহিত হইবে, যাহার সহিত সে মহব্বতের সম্পর্ক রাখে– এই হাদীস তুমি শুনিয়া থাকিবে।

সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর ঐ বৎসরেই ১০৬৪ হিজরীতে বাদশাহ শাহজাহানের তরফ হইতে তিনি মুলতান প্রদেশের দেওয়ানী ও সেনা বাহিনীর উচ্চপদে ও ইতিহাস লেখক হিসাবে মনোনীত হন। বহু বৎসর তিনি সেখানে ছিলেন। ধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ দেখিয়া ও তাঁহার উপদেশ বাণী শ্রবণ করিয়া পাঞ্জাবের জনসাধারণ তাঁহাকে পীরের মত শ্রদ্ধা করিতেন। এখনও পর্যন্ত (হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাবধি) তিনি সেখানকার জনসাধারণের মুখে মুখে মীরক জিউ নামে সমাদৃত হইয়া আছেন। মুলতান হইতে দুই ক্রোশ (চারি মাইল) দূরে তিনি একটি বাগান ও বাসস্থান নির্মাণ করেন, যাহা মীরক জিউয়ের কেল্লা (কোটলা) নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বকালে তিনি কাবুলের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আমানত খান উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছিল। পদমর্যাদার দিক হইতেও তাঁহাকে আরও উচ্চপদ প্রদান করা হইয়াছিল। ইহার পরে কোন কারণ বশতঃ তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহার সততা ও আমানতদারীর চিত্র বাদশাহ আলমগীর র. এর হৃদয়ে স্থায়ীভাবে অংকিত হইয়া গিয়াছিল সেই জন্য অনতিবিলম্বে লাহোরের রাজধানীর (দারুস সুলতানাত) তত্ত্বাবধান এবং সেখানকার কেল্লার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন এবং পদত্যাগ করার সময়ে তিনি লাহোর প্রদেশের যে দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পুনরায় তাঁহাকে সেই পদে বহাল করা হয়। লাহোরে তিনি হাবেলী খোয়াফী ও বড় বাজার সংলগ্ন বাসভবন ও স্নানাগার (হাবেলী ও হাম্মাম) তৈরী করেন। আলমগীর র. এর সিংহাসন আরোহণের বাইশ বৎসর কালে, বাদশাহ যখন আজমীরের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের দেওয়ানীর সম্মান লাভ করেন। আলমগীর র. এর রাজত্বের পঁচিশ বৎসর কালে আওরঙ্গাবাদের শুভ ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে যখন শাহী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তখন নিজাম শাহের হাবেলী যাহা সবুজ গ্রীষ্মবাস (বাংলা) হিসাবে প্রসিদ্ধ সেই স্থানে মীরক মঈনউদ্দীনের থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার পর তিনি আওরঙ্গাবাদ হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত হরসুল গড়ে, মূলতানের মত নিজের বাসস্থানের জন্য স্থান নির্বাচন করিতে চাহেন। বাদশাহ রাজ কোষাগারের নিকট মূলক আম্বর নামক হাবেলী তাঁহার বাসস্থানের জন্য বিবেচনা করেন। এই স্থানও ছোট কেল্লা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ১০৯৫ হিজরীতে মীরক মঈনউদ্দীনের ইন্তেকাল হয়। আওরঙ্গাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত শাহ নূর হাম্মামী র. এর দরগাহের সন্নিকটে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। মিয়া শাহ নূর হাম্মামী র. বলিতেন, আমার নিকট লোকে যে বস্তুর সন্ধান করিতে আসে, বাবায়ে পীর তাহা নিজের কাছে রাখেন, যাহার ইঙ্গিত ছিল মীরক মঈনউদ্দীন র. এর প্রতি।

খোয়াফী খান সাহেবের ইতিহাস লেখক সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, তিনি এই রকম সৎ ছিলেন যে নিজের উন্নতির জন্য তিনি কখনও কোন চেষ্টাচরিত্র করেন নাই। জনসাধারণের কল্যাণের ব্যাপারে তিনি সরকার অপেক্ষা বেশী চিন্তাভাবনা করিতেন। তাঁহার শাসনকালে কখনও কাহারও জানমালের কোন ক্ষতি হয় নাই। বস্তুতঃ আমানত খান মীরক মঈনউদ্দীন আহমদ র. এর সময়ে সেরকম কোন কিছু শোনা বা দেখা যায় নাই।

আশা করি এই ফকিরের বাতেনী ঐশ্বর্য হইতে পরিপূর্ণতা অর্জন করিবে এবং সমৃদ্ধশালী (ফয়েজমন্দ) হইবে। নিজের মধ্যে এমন কোন পারদর্শিতা এই ফকির দেখিতে পায় না, যাহার বদৌলতে তুমি আমার নিকট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আদেশের (আমরে আ'জীমের) জন্য আবেদন করিতে পার। কিন্তু যেহেতু ইহা তুমি তোমার সুন্দর ধারণা হইতে লিখিয়াছ, সেইজন্য আশা করি, তোমার এই ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে যেন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং মরুভূমি হইতে তোমার কোষাগার রত্নরাজিতে ভরিয়া উঠে। হাদীসে কুদসীতে আছে, আমি আমার বান্দার ধারণা হইতেও নিকটে থাকি। অবশ্য আমি তোমার জন্য অদৃশ্য মনোযোগের (গায়েবানা তাওয়াজ্জোহ্) ব্যাপারে, ইনশাল্লাহুতায়ালা কার্পণ্য করিব না। নিজের সময়কে আনুগত্য দ্বারা মশগুল রাখিবে, ক্রীড়া কৌতুক হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে। দুনিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা, কবরের অবস্থানসমূহ এবং কেয়ামতের ভয়কে চোখের সম্মুখে রাখিবে। সুন্নতের আনুগত্য করা এবং বেদাত হইতে বাঁচিয়া থাকার মধ্যেই যে নাজাত, তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। বেদাতী ও দুনিয়াদার মোল্লার সহিত কোন সঙ্গ-সংশ্রব রাখিবে না। কেননা, এই ধরনের লোকেরাই দ্বীনের চোর হইয়া থাকে। যে ফকির শরীয়তের রীতিনীতি অনুসরণ করে না এবং নবী করীম স. এর সুন্নত দ্বারা যে সজ্জিত নয়, তাকে নিজেদের মজলিশে ঠাঁই দিবে না।

'পয়গম্বর তোমাদিগকে যাহা আদেশ করেন তাহা (মনেপ্রাণে) কবুল কর, যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহা পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর।' (কোরআন)।

আস্‌সালামু আলাইকুম।

জমিদার শ্রেণীর লোকেরা এবং দাবী আদায়ের ব্যাপারে অন্যান্যগণ জেলখানায় থাকিতে থাকিতে নিঃস্ব ও ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হইতেন। তাঁহারা জেলখানায় থাকিলে সরকারের বদনাম হওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হইত না। এই সব কারণে মীরক মঈনউদ্দীন র. সম্মানিত কয়েদীগণের নিকট হইতে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করার শর্ত আদায় করিয়া তাঁহাদিগকে জেলখানা হইতে ছাড়িয়া দিতেন। এই ধরনের ব্যবস্থার ফলে একবার লাহোরে দুই লক্ষ টাকার লোকসানের খবর সংবাদ লেখকের মাধ্যমে পৌঁছাইয়া যায়। বাদশাহ এই খবরে তাঁহার প্রতি কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে প্রকৃত তথ্যাদি জানিতে পারিলেন তখন ক্ষতির ব্যাপারটি উদারভাবে মানিয়া লইলেন। দাক্ষিণাত্যেও কয়েক বৎসরে দশ বার লক্ষ টাকার বকেয়া পড়িয়াছিল, যাহা দরিদ্র ও দুর্বল প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য প্রতি বৎসর বহু কর্মচারীকে নিয়োজিত করা হইত। মীরক মঈনউদ্দীন আহমদ ঐ সমস্ত বকেয়া এক প্রকার মাফ করিয়াই দিয়াছিলেন। একদা বাদশাহ আলমগীর মীরক মঈনউদ্দীন আহমদের সততার খুব প্রশংসা করিলে তিনি আরজ করিয়াছিলেন, বাদশাহ নামদার, আমার দ্বারা কোন অবিশ্বাসের কাজ করা তো সম্ভব নয়, তবে রাজস্ব বাবদ গরীব প্রজাদের নিকট হইতে সরকারের বহু পাওনা টাকা আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। ইহার উত্তরে বাদশাহ বলিয়াছিলেন, আমি জানি যে, তুমি এইভাবে আমার আখেরাতের কোষাগারকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছ।

মীরক মঈনউদ্দীন আহমদ জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি বা বিত্তশালী হওয়ার রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন এবং সাংসারিক লৌকিকতা ইত্যাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি শরীয়তের আদব সম্পর্কিত 'শরীয়াতুল ইসলাম' নামক গ্রন্থের সংকলন ও অনুবাদ করেন। তিনি হস্ত লিপিতে ও ফারসী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার সাতটি পুত্র সন্তান ও সাতটি কন্যা সন্তান ছিল।

(এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'মায়সারুল উমরা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (পৃষ্ঠ-২৫৮-২৬৭) হইতে গৃহীত)।

নজর বেগ সমরখন্দীর নিকট
লিখিত। মকতুব নং–২১

আলহামদুলিল্লাহিল আজিম ওয়া সালামুন আলা রাসুলিহিল করিম। আল্লাহ্তায়ালা যেন সব সময় নিজের সঙ্গে রাখেন এবং এক মুহূর্তও যেন তিনি সঙ্গহারা অবস্থায় না রাখেন। মহব্বতের সহিত যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছ তাহা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। এইভাবে নিজের অবস্থাসমূহের কথা সবসময় লিখিতে থাকিবে, যাহা অদৃশ্যভাবে মনোযোগ আকর্ষণের কারণ হইতে পারে। যে স্বপ্ন অবলোকন করিয়াছ, তাহা খুবই সুন্দর এবং স্বর্গীয়সুষমায় পরিপূর্ণ। নিজের কাজে সর্বদা লাগিয়া থাকিবে। তোমার বাতেনী অবস্থা, জিকির ও ফিকির এবং তাহার ফলাফল সম্পর্কে কিছুই জানাও নাই, সর্ব প্রথমে এইসব সম্পর্কে লেখা উচিত ছিল। অন্যান্য বিষয় ইহার পরিপূরক ও অংশ বিশেষ।

সে ছিল আমার অনেক দিনের
প্রাণ-প্রিয় বন্ধু,
বন্ধুর পুত্র সে, যথেষ্ট আমার কাছে
এই পরিচয় শুধু।

আসল কথা হইতেছে, এমনভাবে গভীর বিশ্বাসের সহিত সর্বদা জিকির করিবে যাহার ফলে জিকিরের উপস্থিতি হৃদয়ের সর্বেসর্বা হইয়া যায়। অন্য কোন কামনা ও অভিলাষ যেন কেবলমাত্র পবিত্র আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্তরে আর অবশিষ্ট না থাকে।

এই কাজে তো তোমার যোগ্যতা ছিল না কিছু,
হয়েছে অর্থের জোরে, তাই ছুটেছ অর্থের পিছু।

বন্ধুগণের নিকট হইতে সালামতী ও শুভ পরিণামের দোয়ার প্রত্যাশায় সকলকে সালাম জানাই।

সৈয়দ আলী বারহিয়ার
নিকট লিখিত। মকতুব নং—২২

আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, মোহাম্মদ স. এর জন্য দরূদসমূহ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর জানাইতেছি যে, তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত ও প্রীত হইয়াছি। তুমি সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ কিন্তু তাহা সময়ের উপর নির্ভর করে। দুনিয়া তো বিচ্ছেদের জায়গা। দোয়া কর যেন হকতায়ালা আখেরাতে তোমাকে আমাকে একত্রিত করেন। আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ তো আখেরাতের জন্যই নির্দিষ্ট রহিয়াছে। মৃত্যু তাহার বাতায়ন স্বরূপ।

এই দুনিয়া শষ্যক্ষেত্র অপেক্ষা বেশী কিছু নয়। আমলের মধ্যে যত আন্ত রিকতা ও সততা থাকিবে, সর্বশেষ পরিণামে তাহার ফলাফল ও পুরস্কার প্রাপ্তির আশাসহ নৈকট্যপূর্ণ মর্যাদালাভের সম্ভাবনাও তত বেশী থাকিবে। শরীয়তের পুস্ত কসমূহ হইতেই আমলের রীতিনীতি ও বিধানসমূহ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। প্রকৃত আন্তরিকতাপূর্ণ আমল ইসলামের মূলতত্ত্ব ও নফসের প্রশান্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ইসলামের মূলতত্ত্ব ও নফসের প্রশান্তি আবার সুফীয়ায়ে কেরামদের সহবতের সহিত সম্পর্কিত। যে আমলে আন্তরিকতা নাই, তাহা রূহ্‌হীন দেহের মত। যাঁহারা সরল পথের প্রতি বিশ্বস্ত তাঁহাদিগকে সালাম।

টীকাঃ তারিখে মোহাম্মদী গ্রন্থে ১১১৯ হিজরীতে একজন ব্যক্তিত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহাতে লিখিত আছে, সৈয়দ নুরুদ্দীন আলী খান বিন সৈয়দ আব্দুল্লাহ খান বারহিয়া বাদশাহ্‌ আলমগীরের রাজত্বকালে একজন ওমরাহ এবং শাহ আলমের সঙ্গী ছিলেন। মোহাম্মদ আজমের সহিত যুদ্ধে তিনি ১১১৯ হিজরীতে নিহত হন। সম্ভবতঃ এই মকতুব তাঁহাকে লেখা হইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মায়সারুল উমরাহ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ১৭৬ পৃষ্ঠায় তাঁহাকে হোসেন আলী খান এবং হোসাইন আলী খানের ভাই বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

সৈয়দ নূর বহর বারহিয়ার
নিকট লিখিত। মকতুব নং-২৩

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াস সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা। রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় সম্মানীয় উচ্চমর্যাদার অধিকারীর নিকট এই মিসকিন সালাম জানাইতেছি এবং তাঁহার শারীরিক সুস্থতা কামনা করিতেছে। ভালবাসার সহিত যে পত্রখানি পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া খুশী হইয়াছি। এইভাবে নিজের প্রকাশ্য ও গোপন (জাহের ও বাতেন) অবস্থাসমূহের বিষয়ে লিখিতে থাকিবে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে এই ধরনের যোগাযোগ অদৃশ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহায়ক হইয়া থাকে।

দেখ, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় যৌবন অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে এবং জীবনের নিকৃষ্টতম সময় বার্ধক্য তাহার আগমন বার্তা ঘোষণা করিতেছে। এই ভাবিয়া আফসোস্ হইতেছে যে, যাহা সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ সেই আল্লাহ্র মারেফতের দায়িত্ব বার্ধক্যের নিকট অর্পণ করিতে হইবে। আবার জীবনের সর্বোত্তম সময়কে নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ যেমনঃ কামনা, লোভ-লালসা ও দুনিয়ার সৌন্দর্য-সম্ভোগ ইত্যাদির জন্য ব্যয় করিতে হয় (যদিও এই রকম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়)। সময়কে সব সময় আল্লাহ্তায়ালার স্মরণে ও চিন্তায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং আখেরাতের জন্য উত্তম পুঁজির সওদা করিবে।

ওয়াস্ সালাম।
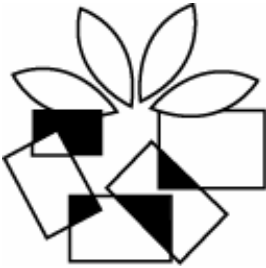
হাফেজ মোহাম্মদ শরীফ লাহোরীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং– ২৪

নৈকট্যের পথে আল্লাহ্তায়ালা যেন তোমাকে কল্পনাতীত উন্নতি প্রদান করেন। তোমার পত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আল্লাহ্পাকের নিকট অশেষ শুকরিয়া যে, তোমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। দেখ! গর্দানকে নত অবস্থায় রাখার নাম বন্দেগী। নিজ ইচ্ছার কবল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আল্লাহ্পাকের মর্জির অধীন হইয়া

যাওয়ার মধ্যেই বন্দেগী। প্রেমাস্পদের নিকট হইতে যাহা কিছু আসে, তাহার সব কিছুই প্রেমময় হইয়া থাকে– তাহা পুরস্কার কিংবা তিরস্কার– যাহা কিছু হউক না কেন। আশেক প্রেমের খাতিরে মাশুকের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করে। তাহার দৃষ্টিতে প্রেমিকের যাবতীয় কার্যকলাপ সুন্দর ও মনোহর রূপে ধরা দেয়। এমন কি, যদি কোন দুঃখ কষ্ট তাহার তরফ হইতে আসিয়া পৌঁছায়, আশেক তাহা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করে এবং তাহার নিকট ঐ দুঃখকে আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হয়। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্তায়ালার এই মীমাংসার মধ্যে মোমেনের হক অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, যখন মোমেনের নিকট ভাল কোন কিছু পৌঁছায়, তখন তাহার জন্য সে নিজ পালনকর্তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং যখন তাহার নিকট কোন বিপদ আপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনও সে তাঁহার প্রশংসা করে ও ধৈর্য ধারণ করে। একজন মোমেন তাহার প্রত্যেক কাজের জন্য পুরস্কার পায়– এমনকি তাহার স্ত্রীর মুখে যে খাবার সে তুলিয়া দেয়, সেই খাবারের লোকমার জন্যও।

প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকলকে সালাম।

সৈয়দ নূর বহরের নিকট লিখিত। মকতুব নং–২৫

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াস সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা। তোমার পত্র পাইয়াছি। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নিকট এইজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যে, তোমার সমস্ত প্রহরগুলি তাঁহার জিকির দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। সর্বদা সুন্নতের প্রতি অনুগত থাকার চেষ্টা করিবে। বেদা'ত ও বেদা'তকারীগণের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। মহৎ পুণ্যাত্মাগণ এবং যে সমস্ত ফকির শরীয়তের প্রতি অটল ও পাবন্দ থাকেন, তাঁহাদের দিকে নিজেকে আকৃষ্ট রাখিবে।

টীকাঃ তারিখে মোহাম্মদী কলমী (রেজা লাইব্রেরী রামপুর)– এর মধ্যে তাঁহার বর্ণনা ১২০৮ হিজরীতে এইভাবে পাওয়া যায়– সৈয়দ নূর বহর বারহিয়া যিনি সাইফখান নামে পরিচিত ছিলেন, বাদশাহ্ আলমগীরের উমরাহগণের মধ্যে তাঁআর নাম পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তিনি সৈয়দ বারহিয়া বংশোদ্ভূত ছিলেন। ১১০৮ হিজরীতে দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রেমিকের খোঁজ পেলে তাদের সাথে রেখো
মেলামেশা আপন মতন
সহবতে থেকে থেকে তুমিও হয়তো দেখো
হয়ে যাবে প্রেমিক এমন।
প্রেমের আঘাত পেলে সে আঘাত খুশী মনে
রাখিও অন্তরে তব ধরি
যেথা প্রেম ও প্রেমিক নাই, পড়িও না আকর্ষণে
অনর্থক মেলামেশা করি।

আর প্রকৃত আশেক ব্যক্তি সেই হইতে পারে, যে পয়গম্বর আলায়হি সালাতু ওয়া সালামের প্রতি অকপট আনুগত্যে অটল থাকিতে পারে। কুল ইন কুন্‌তুম তুহিবুনাল্লহা ফাত্তাবিউনি ইউহ্‌বিব কুমুল্লাহ্– পাক কালামের এই আয়াত হইতে সেই সত্যেরই প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে।

যাঁহারা সরল পথের প্রতি অনুগত তাঁহাদের সকলের প্রতি সালাম।

মিরজা খানের নিকট লিখিত।
মকতুব নং– ২৬

আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য সমস্ত প্রশংসা ও নবী করিম স. এর প্রতি দরূদসমূহের পর জানাইতেছি, তুমি যে টাকা প্রেরণ করিয়াছ, তাহা পাইয়াছি এবং তোমাকে সেজন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। এইদিকের ফকিরদের অবস্থা আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসার যোগ্য। তোমার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, শরীয়ত ও সুন্নতের প্রতি অটল অবস্থা এবং মর্যাদাবাহী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উন্নতি কামনা করি। তোমার পত্রও পাইয়াছি।

দেখ, যে সমস্ত দোয়া ও জিকির সম্পর্কে এই ফকির তোমাকে বলিয়াছে, তাহা এই তরিকার শর্তাবলীর সহিত পরম্পরাযুক্ত মুখ্য বিষয় ছিল না কিংবা তরিকার রীতিনীতির উপর যে তাহাতে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল তাহাও নয়। তথাপি তাহা এই রকমভাবে বলা ছিল, যাহাতে তুমি একেবারে খালি অবস্থায় না থাক এবং সহবত লাভ করার মাধ্যমে তুমি সময় অতিবাহিত করিতে পার, যেন গাফলতীর ভিতরে থাকিয়া সময় নষ্ট না হইয়া যায়।

“আযকার ও আদীয়ায়ে মাসুরা” নামক পুস্তিকাটি এই ফকির বিশ্বস্ত হাদীস দ্বারা সংকলিত করিয়াছে এবং বিশেষ বিশেষ জিকির ও দোয়ার গুণাবলীও সেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পুস্তিকার নকল তোমার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যতদূর ইহার উপর আমল করিতে পার, আমল কর। পুস্তিকাটি আকারে বড় এবং তাহা ফারসী ভাষায় লিখিত। প্রচুর ফায়দা ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। তুমি যদি অভিনিবেশ সহকারে পুস্তিকাটি আগাগোড়া অধ্যয়ন করিতে পার তাহা হইলে উত্তম ও ফলপ্রদ হইবে। এই পুস্তিকাটি একটি রত্নভাণ্ডার ছাড়া আর কিছু নয়, যাহা যথাসময়ে নৈকট্য লাভ করার রহস্যে-পরিপূর্ণ একটি সমুদ্র এবং যাহা পবিত্র মনজিলসমূহে পৌছাইয়া দিতে সক্ষম। ইহার গভীর তলদেশ হইতে খাঁটি মুক্তা আহরণের জন্য সত্যিকার ডুবুরির প্রয়োজন। যদি কোন সাঁতারু থাকে, তাহা হইলে সে ইহার মধ্যে সাঁতার কাটিয়া তাহার আকাঙ্খিত স্থানে পৌছাইয়া যাইবে।

তুমি লিখিয়াছিলে যে, কোন কোন পথের জন্য কামেল শায়েখের সহবত অতীব জরুরী। কিন্তু এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সিলসিলাতে অদৃশ্যভাবে ফায়দা প্রাপ্তির মহফিলে ভিড় জমিতেই থাকে। যেমন হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ র. ও হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর মাকামাতে বেলায়েতের পথ এবং নৈকট্যের মনজিলে প্রবেশ করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে হজরত খাজা র. এর খেদমতে থাকাকালীন অবস্থাতেই যোগ্যতার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহারই সহবতের পূর্ণ আলোকে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পূর্ণতা ও সমাপ্তির স্তরসমূহ তিনি অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর মকতুব হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক যে, পথের সমাধান পাওয়ার পর যখন তিনি স্বগৃহে যাওয়ার জন্য দিল্লী হইতে পৃথক হইয়া যান, তখন পরস্পরের মধ্যে চিঠি-পত্রের আদান প্রদানের মাধ্যমে সিলসিলা জারি থাকে এবং সওয়াল ও জবাবের পালা চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার যে যে ফায়দা ও প্রাপ্তিযোগসমূহ সাধিত হইয়াছিল তাহা সকল বিতর্কের উর্ধ্বে, কেননা পরে পাওয়া এই সমস্ত লাভের বিষয় ছিল পরিপূর্ণতা অর্জনকারী পথের বিন্যাস দ্বারা পরিপূর্ণ। নফসের পরিপূর্ণতা অর্জন এবং মনজিলসমূহের পথ প্রাপ্তির জন্য শায়েখের সহবত অত্যন্ত জরুরী।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. বন্ধুত্বের সম্পর্ক–লাভকারী (নেসবতে মাহবুবিয়াত) হালতের অধিকারী ছিলেন। সহবতহীন কোন পীর যদি অদৃশ্যভাবে ফয়েজ ও বরকতসমূহ জোরপূর্বক আদায় করিয়া লইতেন, তাহাতেও কোন কথা থাকিত না– কেননা প্রেমিকদের রকম–সকমই আলাদা রকমের হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে নির্বাচিত পথের দিকে লইয়া যাওয়া হয় এবং সুপ্রশস্ত মনজিলে পৌছাইয়া দেওয়া হয়।

যদি সে না আসে নিজ হতে খুশী মনে
চুলের বাহার তাকে আনবে যে টেনে।

যদি প্রকাশ্যে পীরের সহিত কোন সম্পর্ক নাও থাকে, তবু আল্লাহ্তায়ালা তাহার প্রতি দয়া করেন এবং একেবারে পথের মাঝে ছাড়িয়া দেন না। ইহা ব্যতীত বাকী সমস্ত কিছু এনাবতের রাস্তায় চলে এবং প্রকাশ্যে পীরের সহবতের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। ইহার সহিত উহার বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর বন্ধুত্ব (মাহবুবিয়াত) হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ র. এর নিকটও সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত ছিল। হজরত খাজা র. আমাদের হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সম্পর্কে এই কবিতা পাঠ করিতেন–

প্রিয়ার হিয়ার মাঝে গোপনে লুকানো থাকে
আমরণ প্রেমের বৈশাখী ঝড়—
আর প্রেমিকের প্রেম-উন্মত্ত মত্ততা থেকে
জেনে যায় সবে প্রেমের খবর।
প্রেমের কারণে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ে
প্রেমিকের দেহতনুমন—
আর প্রেমের সায়রে নিভৃতে সাঁতার কেটে
ফুটে উঠে প্রিয়া ফুলের মতন।

এই ফকির যাহা কিছু লিখিয়াছে তাহা এনাবতের রাস্তার সহিত সম্পর্কযুক্ত। সাধারণভাবে ইহাই হইতেছে মুরিদের পথ। এই পথ সম্পর্কেই আমি লিখিয়াছিলাম যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শায়েখের সহবতের উপরে উন্নতির সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে।

সেই সমস্ত উদার ও উচ্চ আখলাকের (আচার ব্যবহারের) মহত্ব হইতে তুমি কিছুমাত্র দূরে নহ। সর্বদা দোয়ার সহিত নিরাপত্তাজনিত শুভ পরিণতির জন্য স্মরণ রাখিবে।

যাঁহারা সরল পথে চলেন এবং নবী করিম স. এর অনুসরণ করেন তাঁহাদের সকলের প্রতি সালাম।

মাওলানা বরখোরদার কাবুলীর নিকট লিখিত। মকতুব নং–২৭

তুমি যে সুন্দর পত্রখানি এই মিসকিনের নামে লিখিয়াছিলে, তাহা পাইয়া নিজেকে সম্মানিত ও আনন্দিত বোধ করিতেছি। তোমার চিঠিতে তুমি আনন্দের সহিত মহান ও উচ্চ আকাংখার প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করিয়াছ। ইহা অত্যন্ত কল্যাণকর ও সৎ আকাংখা। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার নেক আগ্রহের শিখাকে প্রজ্বলিত করিয়া দিন, আকাংখার শিখাকে আরও অধিক আলোকিত করিয়া দিন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তু হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার নৈকট্য ও মারেফতের আলয় পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিন– ইন্নাহু ক্বারিবুম্ মুজিব।

যে স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ, সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট, যাহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের মধ্যে পরবর্তী সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত কলেমা তৈয়েবার বিরামহীন আমলের মধ্যে মশগুল থাকিবে এবং যতদূর পারিবে কলবের অনুকূল অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই জিকির করিতে থাকিবে। এই জিকির যদি নির্জনে করিতে পার, তাহা হইলে আরও ভাল। এই কলেমা তৈয়েবা বাতেনের পরিশুদ্ধির জন্য আশ্চর্য রকমের কার্যকরী ক্ষমতা রাখে। ইহার প্রথম অংশে (লা ইলাহা) সত্য ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর প্রতি অস্বীকৃতি এবং দ্বিতীয় অংশে (ইল্লাল্লাহ্) আল্লাহ্‌তায়ালার সত্যের প্রতি স্বীকারোক্তি– আর ইহাই হইতেছে সমস্ত পথের (সুলুকের) সারকথা। হাদীস শরীফে আছে, আফজাল অর্থাৎ সর্বোত্তম জিকির হইতেছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আনুগত্যের প্রতি অটল থাক এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের আমল কর। বেদাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে এবং অবিশ্বাসীদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। জনৈক বুজুর্গ বলিয়াছেন, ভাল কাজতো ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকারের লোকে করিয়া থাকে কিন্তু আদেশ অমান্য করা হইতে নিজেকে বিরত রাখা হইতেছে সত্যবাদীর (সিদ্দীকের) জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই মিসকিনকে দোয়া ও সালামতীর সহিত স্মরণ রাখিও।

[ইহার পর একটি প্রশ্নের জবাবে বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থানসমূহের ও তাহার পরিবর্তনের বিষয়ে হাদীসের আলোকে আত্মিক ভ্রমণের ফল লাভ (সায়ের

হাসিল) সম্পর্কে আলোচনা করেন। হাদীসের বিভিন্ন তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা প্রমাণিত করেন যে, মূল্যবান ও মনোরম পোশাক, সালেকের (আত্মিক-ভ্রমনকারীর) জন্য ক্ষতিকর নয়। হাদীসের মূল তাৎপর্যসমূহ উদঘাটন করিয়া শরীয়ত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং নিজস্ব বোধশক্তি হইতে সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন বিস্ময়কর বিষয়সমূহ বর্ণনা করেন। এই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও বর্ণনা যাহা কেবল হাদীস বিশেষজ্ঞদের বোধগম্যের অন্তর্ভুক্ত, তদসংক্রান্ত কয়েক পৃষ্ঠার অনুবাদ এখানে বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

(এই মকতুবের শেষের দিকে তিনি বলিতেছেন)– তুমি লিখিয়াছ, বেদাতী, ঘুষখোর অথবা খোলাখুলিভাবে যাহারা পাপকার্য ও ব্যভিচারে লিপ্ত তাহাদের নিকট যাওয়া এবং তাহাদের আহার্য বস্তু ভক্ষণ করা কি রকম কাজ হইবে? দেখ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সর্ব প্রথমে ঐ সমস্ত লোকের নিকট যাওয়া হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং তরিকার প্রেমিকদের জন্য তো তাহা অবশ্য কর্তব্য। তবে হ্যাঁ, প্রয়োজন কোন আইন মানে না অর্থাৎ সেরকম কোন জরুরী প্রয়োজনের বিষয় স্বতন্ত্র। খাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ের সারকথা হইতেছে, যদি জানা যায় কোন খাবার হারাম পদ্ধতি দ্বারা উপার্জিত তাহা হইলে ঐ খাদ্য আহার করা হারাম। আর যদি জানা যায় যে, উহা হালালভাবে সংগৃহীত তাহা হইলে ঐ খাদ্য হালাল। আর যে ক্ষেত্রে হারাম হালাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, সে ক্ষেত্রে ঐ আহার্য বস্তু সন্দেহজনক এবং তাহা আহার না করাই উত্তম।

তুমি আরও একটি কথা লিখিয়াছ যাহা হইতেছে, কোন কোন অস্বীকারকারী নাকি বলে যে, কোন বিশেষ তরিকা অনুসারে মুরিদ করা বেদাত কাজ। দেখ, সত্যের সন্ধানে আহবান করা, দ্বীনের পথে পথ প্রদর্শনের জন্য মনোনীত করা এবং এই বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছার সহিত সম্পর্ক কায়েম করা শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী করা হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালা আদেশ করেন– ওয়াব তাগু এলাইহি ওয়াসিলা– অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে অসিলার সন্ধান কর। ফায়দা এবং লাভের সন্ধান পাওয়ার মত মৌলিক বিষয়ের কার্যক্রম (সিলসিলা) যাহাকে অন্য নামে পীরি-মুরিদী বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা পয়গম্বর আলায়হি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আসসালাতু ওয়া সাল্লামের অর্থাৎ পয়গম্বর আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের জামানা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহা এমন কোন নূতন বিষয় নয়, যাহা মাশায়েখ এবং সূফীগণ নিজের ইচ্ছামত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমস্ত মাশায়েখের কার্যক্রম ও সিলসিলা আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানোর পর সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। নকশবন্দিয়া তরিকার সিলসিলা হজরত সিদ্দীকে আকবর (হজরত

আবুবকর সিদ্দীক) রদ্বিআল্লাহুতায়ালা আনহুর মাধ্যমে এবং বাকী অন্যান্য তরিকার সিলসিলা হজরত আলী রদ্বিআল্লাহুতায়ালা আনহুর মাধ্যমে সরদারে কায়েনাত হুজুর সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়াছে। তাহা হইলে এই বায়াত হওয়ার তরিকা বেদাত কাজ বলিয়া কিভাবে পরিগণিত হইতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্য ইহা বলিতে পার যে, পীরি-মুরিদী শব্দটা নূতন শব্দ–কিন্তু শব্দের কোন সমাদর থাকিতে পারে না।

মিলনের মৌলিকত্ব এবং তাহার প্রসার নিজ হইতেই বহাল থাকিবে। 'এই বিশেষ তরিকায় মুরিদ করা বেদাত কাজ' বলিতে জানি না 'বিশেষ তরিকা' কোন উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে। আমাদের তরিকায় শিক্ষা ও জিকির রহিয়াছে। জিকির সম্পর্কে খোদ শরীয়তের আদেশ রহিয়াছে। ইহা তো এই রকম ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় যে, সহি বোখারী পাঠ করা এবং সত্য পথের পাঠ দেওয়াকে কেহ বেদাত কাজ বলিয়া আখ্যায়িত করিল।

যাহারা শরীয়ত ও সুন্নতকে অনুসরণ করিয়া সত্য পথে চলে তাহাদের সকলের উদ্দেশ্যে সালাম।

জনাব আবদুল হাকিমের নিকট
লিখিত। মকতুব নং– ২৮

(উপদেশ আকারে এবং পুণ্যাত্মাগণের গুণাবলী সম্পর্কে)

হে ভ্রাতঃ, বে-আদব ও বিদ্বেষমূলক রীতিনীতির সাহচর্য হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ এবং বেদাতী মজলিস হইতে নিজেকে সকল সময় দূরে রাখ। এহিয়া মা'জরাযী কুদ্দিসা সিররূহু বলিয়াছেন, এই তিন শ্রেণীর সংসর্গ হইতে নিজেকে সর্বদা দূরে রাখিবেঃ–

১. গাফেল আলেম উলামাগণ,
২. স্তুতিকারকগণ এবং
৩. মূর্খ (জাহেল) সূফীগণ।

যে ব্যক্তি শায়েখের মসনদে উপবিষ্ট হইয়া আছে, আর তাহার আমল সুন্নতে-রসুল সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ নয় এবং সে নিজে শরীয়তের অলংকারাদি দ্বারা সজ্জিত নয়– খবরদার– খবরদার, সাবধান করিয়া দিতেছি, তাহার নিকট হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে। এমন কি (পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য) ঐ শহরেও অবস্থান করিবে না, যেখানে ঐ ধরনের ভণ্ড প্রতারক বসবাস করে। এমন যেন না হয় যে, সেখানে কিছুকাল বসবাস করিবার পর তাহার প্রতি কোন-না-কোনভাবে, শেষ পর্যন্ত, হৃদয় দুর্বল ও আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং রূহানী কারখানার জগতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই ধরনের ব্যক্তিকে কখনও অনুসরণ করিবার মত উপযুক্ত বলিয়া চিন্তা করা যায় না, কারণ আসলে সে একজন ভণ্ড বর্ণ-চোর। তাহার মধ্যে যদি বিভিন্ন রকমের দীন বেশ ও সন্ন্যাসীসুলভ আচার আচরণসমূহও দেখ এবং বাহ্যতঃ দুনিয়ার সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই বলিয়া মনে ধারণা জন্মে তবু কখনও তাহার প্রতি মুহূর্তের জন্যও মনোযোগী হইবে না, পরন্তু তাহার সাহচর্য হইতে এমন ভাবে পলায়ন করিবে, যেমনভাবে কোন লোক হিংস্র বাঘ দেখিয়া পলায়ন করে।

সাইয়েদুত্ তায়েফা হজরত জুনয়েদ বাগদাদী কুদ্দিসা সিররূহু বলিয়াছেন, সফলকাম হওয়ার সকল পথ্ই বন্ধ, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির সফলতার পথ ছাড়া– যে কেবলমাত্র আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে। সাইয়েদুত্ তায়েফা আরও বলিয়াছেন, বিশ্বাসীগণের পথ বস্তুতঃপক্ষে (আল্লাহ্তায়ালার) কিতাব ও সুন্নতের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং শরীয়ত ও তরীকতের উপর যে সমস্ত উলামাগণের ঠিকমত আমল আছে এবং যাঁহারা নবী করিম স. এর ওয়ারিস হওয়ার মত উপযুক্ত তাঁহারা প্রতিজ্ঞায়, আচার ব্যবহারে এবং সকল কার্যে আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণকারী হইয়া থাকেন। পুনরায় লিখিতেছি যে, যাহারা নবী করিম স. এর আদব ও সম্মানের প্রতি মনোযোগী নয় এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সুন্নতকে পরিত্যাগ করে কখনও কোন অবস্থাতেই তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি (আরেফ) বলিয়া মনে করিবে না। তাহাদের বাহ্যিক ভাবভঙ্গী, আচার আচরণ, মন্ত্রউচ্চারণ, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস এবং একত্ববাদের তত্ত্বকথাসম্পন্ন কপচান বুলির প্রতি আসক্ত ও মোহিত হইয়া পড়িও না।

শরীয়তের আনুগত্যকে ঘিরিয়া সমস্ত কর্মের পরিধি ব্যাপৃত এবং পরিত্রাণের উপায় কেবলমাত্র রসুলে করিম সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পদচিহ্ন অনুসরণ করার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ন্যায় ও সত্যের সঙ্গে মিথ্যা ও ধ্বংসকারী বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী জ্ঞান কেবলমাত্র পয়গম্বর স. এর আনুগত্যের মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্মের প্রতি আসক্তি এবং আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পূর্ণ

বিশ্বাস (তাওয়াক্কাল) ব্যতীত রসুল স. এর প্রতি আনুগত্য কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণ ও ধ্যান এবং প্রেম ও আনন্দ দুই-জাহানের সরদার হুজুর স. এর মাধ্যম ও সহায়তা ব্যতীত মূল্যহীন অপ্রয়োজনীয় বস্তু। কারামতের পরিধি তো সাধনা ও পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল, মারেফতের সহিত তাহার সম্পর্ক কোথায়?

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মোবারক র. বলিয়াছেন, আদবসমূহ পালন করিতে যে অলসতা প্রদর্শন করে, সে সুন্নত পালনে অকৃতকার্য হয়, যে সুন্নতসমূহ প্রতিপালনে গাফেল হইয়া পড়ে, সে ফরজ পালন করিতে ব্যর্থ হয় এবং যে ফরজ পালন করিতে গড়িমসি করে, সে আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয় লাভ করা (মারেফত) হইতে বঞ্চিত হয়।

শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের র. কে লোকেরা বলিল, অমুক ব্যক্তি পানির উপর দিয়া যাতায়াত করে। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, খড়কুটাও তো পানির উপর দিয়া যায় (কিন্তু ইহাতো কোন আশ্চর্যের কথা নয়)। পুনরায় তাহারা বলিল, অমুক লোক বাতাসে উড়িয়া চলে। উত্তরে তিনি বলিলেন, চিল ও মাছিও তো বাতাসে উড়িয়া চলে। লোকেরা আবার তাঁহাকে বলিল, অমুক লোক পলকের মধ্যে এক শহর হইতে অন্য শহরে চলিয়া যাইতে পারে। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে, শয়তানও তো এক নিঃশ্বাসে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে চলিয়া যায়। এই সমস্ত কথার কোন মূল্য নাই। পক্ষান্তরে তিনিই প্রকৃত ব্যক্তি যিনি সৃষ্ট জগতের সঙ্গে থাকিয়াও নিজেকে সেখান হইতে সরাইয়া রাখেন এবং স্ত্রী পুত্র পরিবারের সঙ্গে অবস্থান করিয়াও এক মুহূর্তের জন্য মহান প্রভু আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে গাফেল থাকেন না।

শায়েখ আলী ইবনে আবুবকর কুদ্দিসা সিররূহু বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সৌন্দর্য ও পূর্ণতা তাহার সারাজীবনব্যাপী প্রকাশ্যে ও গোপনে, মূলনীতি ও সমস্ত শাখা-প্রশাখায়, জ্ঞান বুদ্ধি ও কাজকর্মে, অভ্যাসে ও দাসত্বে রসুলে করিম সল্লাল্লহু আলায়হি ওয় সাল্লামের আনুগত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

যদি কেহ কোন সময় কোন পাপকার্য করিয়া ফেলে, সেক্ষেত্রে বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা তাহার সংশোধন করা প্রয়োজন। গোপন গোনাহ্‌সমূহের জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্য গোনাহ্‌সমূহের জন্য প্রকাশ্যভাবে তওবা করিতে হইবে। কোন পাপকর্মের জন্য তওবা করিতে যেন বিলম্ব না ঘটে। কথিত আছে যে, কেরামান কাতেবীন তিন মুহূর্ত (সায়েত) পর্যন্ত গোনাহ্ লিখিতে দেরী করেন। এই সময়ের মধ্যে সত্যিকার অনুতপ্তচিত্তে যদি ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় তাহা হইলে সেই গোনাহ্ আর লেখা হয় না– অন্যথায় তাঁহাদের খাতায় গোনাহ্‌র হিসাব লেখা হইয়া যায়। জাফর বিন সনান র. বলিয়াছেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে

গাফলতী করা পাপকার্য করা অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। যদি জলদি তওবা করার নসীব না হয়, সেক্ষেত্রে মৃত্যু যন্ত্রণার পূর্ব পর্যন্ত যেন অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্তায়ালা রাত্রে তাঁহার দয়ার হস্ত প্রসারিত করেন, যাহাতে দিনের গোনাহ্গার অনুতপ্তচিত্তে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইতে পারে এবং দিনেও তিনি তাঁহার দয়ার হস্ত বিস্তৃত করিয়া দেন, যাহাতে রাত্রির গোনাহ্গার তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারে।

মানুষের উচিত, পরহেজগারী ও সংযমশীলতাকে সে যেন নিজ অভ্যাসে পরিণত করে এবং নিষিদ্ধস্থানে যেন পা না রাখে। কেন না এই আত্মিক পরিভ্রমণের (সুলুকের) পথে নিষেধাজ্ঞা হইতে নিজেকে বিরত রাখা বস্তুতঃপক্ষে আদেশাদি প্রতিপালনের উদাহরণ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ ও উন্নয়নকামী।

জনৈক দরবেশ বলিয়াছেন, ভাল আমল তো সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকারের মানুষই করিয়া থাকে কিন্তু সকল প্রকার পাপ হইতে বাঁচার জন্য চেষ্টা করা কেবলমাত্র সত্যবাদীগণের (সিদ্দীকগণের) কাজ।

হাদীস শরীফে আছে, হালাল যেমন স্পষ্টভাবে বোধগম্য, হারামও তদ্রূপ। আর যে বস্তু সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে, তাহা পরিহার কর।

যদি নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য ব্যবসা বা ঐ জাতীয় হালাল বৃত্তি কেহ গ্রহণ করে, তাহা দোষণীয় নয় বরং প্রশংসনীয় ও পুণ্যকর্ম, কেন না পূর্বপুরুষগণও তাহা করিয়া গিয়াছেন। হাদীস শরীফে হালাল বৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি কেহ আল্লাহ্তায়ালার উপর ভরসাকে একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করে তবে তাহাও উত্তম– কিন্তু শর্ত হইতেছে যে, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবে না এবং লোভের বশবর্তী হইবে না।

আবু মোহাম্মদ মনাজিল র. বলিয়াছেন, কোন কিছু না করিয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্তায়ালার উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) করার তুলনায় যে কোন হালাল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আল্লাহ্তায়ালার উপর ভরসা করা শ্রেয়ঃ। আহার করার সময় সংযতচিত্ত হইতে হইবে। এত অধিক পরিমাণে আহার করিবে না যাহার ফলে এবাদতে অলসতা ও মন্থরতার সৃষ্টি হইতে পারে এবং এমন কম পরিমাণে আহার করিবে না যাহা (দুর্বলতার জন্য) আল্লাহ্তায়ালার জিকির ও আনুগত্যের ইবাদতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে। হজরত খাজা নকশবন্দ র. এরশাদ করিয়াছেন, ভাল ভাল সুস্বাদু খাবার খাও। কিন্তু দ্বীনের কাজও ভালভাবে পালন কর। খাওয়ার ব্যাপারে আসল কথা হইতেছে, আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সকল সময় অনুগত থাকার জন্য যে পরিমাণ আহার বান্দার জন্য সহায়ক এবং সাহায্যকারী হইতে পারে, তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম ও কল্যাণকর। আর ভিতরের এই আনুগত্যের কারখানাতে যে পরিমাণ অতিরিক্ত আহার বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তাহা নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ ও পরিত্যাজ্য।

যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা ও চালচলনের মধ্যে শুদ্ধ নিয়তের প্রচেষ্টা থাকিবে। যে পর্যন্ত নিয়ত বিশুদ্ধ না হইবে সে পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। লোকের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী মেলামেশা করিবে। যে ধরনের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সত্যিকার উপকার ও প্রকৃত লাভের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা প্রশংসনীয় এবং সেই সঙ্গে জরুরীও বটে।

ভাল ও মন্দ (নেক ও বদ) সকল প্রকার লোকের সঙ্গে খুশী মনে ভাল ব্যবহার করিতে হইবে, যদিও তাহার জন্য অন্তরে আনন্দ অথবা বিরূপ মনোভাব অনুভূত হয়। কোন ব্যক্তি অভিযোগ পেশ করিলে, তাহার সে অভিযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। সকলের সঙ্গে সব সময় উত্তম ব্যবহার করিবে। অকারণে কাহারও সমালোচনা ও বিরোধিতা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। আলাপ আলোচনা ও কথাবার্তায় মিষ্টভাষী হইতে হইবে। কাহারও সহিত যেন রূঢ় ও রুক্ষ আচরণ না করা হয়। অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দৃঢ়তা ও রূঢ়তা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

শায়েখ আবদুল্লাহ র. বলিয়াছেন, দরবেশী কেবলমাত্র নামাজ রোজা এবং রাত্রি জাগরণের নাম নয়– এইগুলি তো দাসত্ব করার উপকরণ মাত্র। দরবেশী তাহাকেই বলে, যাহাতে কাহারও অন্তরে কোন দুঃখ না পৌঁছায়। এই গুণ অর্জন করিতে পারিলে তবেই লোকজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারা যায়।

মোহাম্মদ বিন সালিম র.কে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, একজন আউলিয়াকে কিভাবে চেনা যাইতে পারে। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আউলিয়ার নিদর্শন হইতেছে, সে বিনয়ী, সরল ও নম্র হইবে; সকলের সহিত সুন্দর ব্যবহার করিবে; উজ্জ্বল চেহারা, উদার আত্মা ও আত্ম-সমালোচনার অধিকারী হইবে; অভিযোগকারীর অভিযোগ গ্রহণ করিবে এবং পাপী ও নেককার তামাম সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে।

আবু আবদুল্লাহ্ আহমদ মক্কী কুদ্দিসা সিররূহু বলিয়াছেন, বদান্যতা হইতেছে, যে ব্যক্তির উপর তোমার ক্রোধ আছে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, যাহাকে তুমি ঘৃণা কর তাহার জন্য নিজের অর্থ ব্যয় করা এবং যাহার প্রতি তুমি বিমুখ তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করা। কথাবার্তা বলার সময় তাহার অভাব অভিযোগের প্রতি মনোযোগের সহিত দৃষ্টি প্রদান কর। অধিক নিদ্রা ও বেশী হাস্যপরিহাস করা ঠিক নয়, কেন না ইহার প্রভাবে অন্তর মৃত হইয়া পড়ে।

নিজের সমস্ত কাজের ভার আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি অর্পণ কর এবং হক মওলার খেদমতে সকল সময় নিরলস ও সজাগ থাক। এইরূপ করিলে সমস্ত বিষয়ের তদবীর হইতে নির্লিপ্ত হইয়া যাইবে (এবং সমস্ত কাজ অদৃশ্যলোক (গায়েব) হইতে সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে)। সাইয়েদুত তায়েফা র. অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলিয়াছেন

যে, দুনিয়ার সকল সফলতার রহস্য লুকাইয়া আছে সকল প্রকার প্রয়োজনকে পরিত্যাগ করার মধ্যে। যখন মন কেবল একটি দিকে (আল্লাহ্তায়ালার দিকে) স্থায়ী হইয়া যায় তখন আল্লাহ্তায়ালা তাহার সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া দেন। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি তাহার সকল দুঃখকে একটি মাত্র দুঃখে (অর্থাৎ আখেরাতের দুঃখে) পরিণত করে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কার্য সমাধা করিয়া দেন। এমন কি, এই কারণে আল্লাহ্পাক তাঁহার বান্দাদিগকে ঐ ব্যক্তির প্রতি এমন দয়ালু ও সহানুভূতিশীল করিয়া দেন, যাহার ফলে তাহারা ঐ ব্যক্তির কাজ নিজ হইতে সম্পন্ন করিয়া দেয়।

ইয়াহিয়া মাজরাজি র. বলিয়াছেন, আল্লাহ্র সহিত তোমার যে প্রকার ভালবাসা থাকিবে, আল্লাহ্র সৃষ্টিও তোমাকে সেই প্রকার ভালবাসিবে। তুমি আল্লাহ্কে যে পরিমাণ ভয় করিবে, আল্লাহ্র মখলুকও (সকল সৃষ্ট জীবও) তোমাকে সেই পরিমাণ ভয় করিবে এবং তুমি আল্লাহ্তায়ালার আদেশ পালনে নিজেকে যত বেশী মশগুল রাখিবে আল্লাহতায়ালার মখলুকও তোমার কথা তত বেশী মানিবে।

পরোয়ারদেগারের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কাহারও উপর ভরসা করিবে না। পরিবার পরিজনসহ সকল মানুষের সহিত সৎ আচরণ করিবে। প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাদের সকলের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখিবে, যাহার ফলে তাহাদের দাবী (হক) যেন ঠিকমত প্রতিপালন করা হয়। কিন্তু তাহাদের সহিত যেন তোমার চিরকালের সম্পর্ক সৃষ্টি না হয়, কেননা এইরূপ হইলে আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে অসন্তুষ্টির আশংকা থাকে। তোমার ভিতরের (বাতেনের) অবস্থাসমূহ কখনও কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিও না। সাধ্যানুযায়ী ধনবান ব্যক্তিদের সহিত সম্পর্ক না রাখার চেষ্টা করিবে। সর্ব অবস্থায় নবী করিম স. এর সুন্নতকে অবলম্বন করিয়া চলিবে। বেদাত হইতে সকল সময় দূরে থাকিবে। সালেকের খেয়াল রাখা উচিত, যেন সে কখনও কোন সন্দেহজনক ঘটনার সহিত জড়িত না হয়। মানুষের দোষক্রটির প্রতি যেন সে নজর না দেয় এবং নিজের দোষক্রটির প্রতি যেন তাহার সজাগ দৃষ্টি থাকে। কোন মুসলমান অপেক্ষা যেন সে নিজেকে প্রাধান্য না দেয় এবং অন্য সকলকে যেন নিজের চেয়ে ভাল মনে করে। প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে যেন সে এই বিশ্বাস রাখে যে, তাহার দোয়ার বরকতে আমার কাজ সমাধা হইতে পারে। যে সমস্ত মহৎপ্রাণ পুণ্যাত্মাগণ (সালেহীন) দুনিয়ার মায়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিবে। গরীব মিসকিনগণের সহিত মেলামেশা করিতে পছন্দ করিবে। পরনিন্দার প্রতি কখনও আসক্ত হইবে না এবং এই ধরনের নিন্দনীয় কাজে অন্যকেও সাধ্যমত বাধা দিবার চেষ্টা করিবে। সৎকার্যে আদেশ এবং অসৎকার্যে নিষেধ (আমর বিল মারূফ আওর নেহী আনিল মুনকার) কে নিজ অভ্যাসে পরিণত করিবে। আল্লাহ্র

নিকট অকপটভাবে প্রত্যাবর্তনের জন্য আশান্বিত থাকিবে। সৌন্দর্যের আকর্ষণে আনন্দের অনুভূতিকে অন্তরে প্রকাশ করিবে এবং যে কোন পাপ কাজ হইতে নিজেকে দূরে বহুদূরে রাখিবে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তির নিকট পাপকাজ বিস্বাদ বলিয়া মনে হয় এবং সৎকাজ তাহাকে খুশী করে, সে প্রকৃত মোমেন।

অভাবের জন্য ভীত হইয়া কৃপণতা অবলম্বন করিও না। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, শয়তান তোমাকে দারিদ্রতা ও ক্ষুধার ভয় প্রদর্শন করে এবং মন্দের দিকে প্ররোচিত করে। অভাব এবং অল্পজীবিকার জন্য সংকীর্ণমনা হইও না। ভোগ-বিলাসের কাল তো সম্মুখে আগুয়ান হইয়া আসিতেছে।

হে আল্লাহ্, আরাম-আয়েশের যাহা কিছু আছে, তাহা তো কেবলমাত্র আখেরাতেরই আরাম আয়েশ। এখানকার অভাব অনটন তখনকার জন্য তো প্রাচুর্যের নিমিত্ত হইয়া যাইবে।

ফকির এবং দ্বীনদারদের খেদমতে কোন প্রকার সংকীর্ণতা পোষণ করিবে না। জাফর খালদী র. বলিয়াছেন, সৎব্যক্তিগণের প্রচেষ্টা নিজের ভাইদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে– নিজের ভোগ বিলাসের জন্য নয়। আবু আবদুল্লাহ্ খফীফ র. বর্ণনা করিয়াছেন, জনৈক দরবেশ একদা আমার মেহমান হইয়া হঠাৎ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আমি স্বহস্তে তাঁহার দেখাশুনা ও সেবাযত্ন করার কাজকে জরুরী কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিলাম। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আমি তাঁহার জন্য বড় পাত্র পাতিয়া রাখিতাম এবং উঠাইয়া লইতাম। কিছুক্ষণের জন্য একসময় আমার একটু তন্দ্রাভাব আসিয়াছিল, আর সেই সময় দরবেশ আমাকে ইচ্ছামত তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তোর উপর লানত দিক। এই ঘটনার পরে লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সেই দরবেশ যখন তোমাকে 'আল্লাহ্ তোর উপর লানত দিক বলিয়াছিলেন, তখন তোমার নিজের নফসকে তুমি কিরূপ অবস্থায় পাইয়াছিলে? উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, আমার নিকট এরূপ মনে হইয়াছিল যেন তিনি আমাকে দোয়া করিলেন এবং 'আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক'– এই কথা বলিলেন।

আদবের সহিত সুফিদের খেদমত কর, যাহাতে তাঁহাদের বরকতে তুমি সম্পদশালী হইতে পার। কোন বেআদব আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। আমি সুফিগণের প্রতি আদবের বিষয়ে পৃথকভাবে (পুস্তিকা আকারে প্রকাশের জন্য) লেখা সংগ্রহের এরাদা করিয়াছি। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এই বিষয়ে একটি অমূল্য পুস্তিকা প্রবন্ধকারে রচনা করিয়াছেন এবং আদব সংক্রান্ত কিছু কিছু জরুরী বিষয় তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তিকাটি যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া লইবে। সম্পূর্ণরূপে মাটিতে মিশিয়া এবং অস্তিত্বহীন হইয়া এই সমস্ত বুজুর্গগণের খেদমতে পৌঁছান যায়, অন্যথায়

তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার আকাঙ্খা করা বৃথা। কেননা ইহার বিরোধিতা করিলে ক্ষতিসমূহের সম্ভাবনা থাকে এবং কোন লাভ হয় না।

আবু বকর বিন সাবদান র. বলিয়াছেন, কেহ সুফিদের সাহচর্য অবলম্বন করিতে চাহিলে তাহার পক্ষে উচিত হইবে যে, সে যেন মন হইতে সমস্ত কামনা বাসনা অহংকার ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সহায় সম্বলহীন অবস্থায় তাঁহাদের সহিত অবস্থান করে। আর যদি নিজ পরিমণ্ডলের মধ্যে কোন বস্তুর প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই কাজ তাহার আকাংখিত স্থানে পৌঁছানোর পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে।

সেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুমহান সত্যের অনুসন্ধানে নিজেকে আরামের মধ্যে রাখিলে চলিবে না। সকল সময় ব্যথা-ব্যাকুলতায় নিজেকে উদ্বেল রাখিতে হইবে। আবু বকর তমসতানী র. বলিয়াছেন, সুফীবাদের অপর নাম মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতা। শান্তি থাকিলে আর আধ্যাত্মিক সাধনা থাকে না। মাশুক ছাড়া আশেক কখনও শান্তি লাভ করিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইতে পারে না। তাহার অন্তরের তলদেশ হইতে সব সময় এই আওয়াজ বাহির হইতে থাকিবেঃ–

এই ব্যাকুল হৃদয় আর তৃষ্ণার্ত দু-চোখ
খুঁজিয়া পেয়েছে কাজ ত্যাজি সব কিছু,
চোখ দুটি শুধু তোমারে খুঁজিয়া মরে
মন ছুটে চলে তোমারই পিছু পিছু।

মুরিদকে এই রকম গুণের অধিকারী হইতে হইবে যেমন এই আয়াত শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে।

'যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিসহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নাই।' (সূরা তওবা–১১৮ আয়াত)।

মুরিদের তৃষ্ণা যখন এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিবে এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু প্রশস্ততার পরিবর্তে তাহার নিকট সংকীর্ণ ও অন্ধকার হইয়া পড়িবে, তখন আশা করা যায় যে, আল্লাহ্পাকের রহমত জোশের মধ্যে আসিয়া যাইবে এবং সর্বস্বত্যাগী প্রেমিক আশেককে আল্লাহ্ নিজ আলিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

টীকাঃ এই আয়াত শরীফে ঐ তিন সাহাবী সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যাঁহারা তবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত ছিলেন। এই কারণে তাঁহাদিগকে একঘরে হইয়া ৫০ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে তাঁহাদের তওবা কবুল হয়।

দিলাম তোমাকে আমি অফুরন্ত ভাণ্ডারের
দিক-চিহ্ন আর পূর্ণ পরিচয়–
যদি না পারি পৌঁছাতে কখনও সেখানে আমি
পৌঁছে যাবে হয়ত তুমি নিশ্চয়।

তোমার মত বন্ধুদের নিকট এই মিসকিনের অনুরোধ, আমার মত অসহায় পাপীকে তোমরা দোয়া করা হইতে ভুলিয়া থাকিবে না এবং আল্লাহ্তায়ালার সাধারণ দয়ায় যাহাতে কমপক্ষে মৃত গোনাহ্গারদের দলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি দয়াময়ের নিকট আমার জন্য সেই প্রার্থনা করিবে।

কোথায় রয়েছি পড়ে একা আমি বিজন প্রান্তরে
কে জানে কোথায় পড়িছে তাহার চুলের বাঁধন খুলি
কী অদ্ভুত পাগলামী ঢুকেছে আমার মাথার কোটরে
সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আমি রইলাম সব ভুলি।

সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

মাওলানা মোহাম্মদ আমিন লাহোরীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং–২৯।

প্রশ্নঃ সুফিতত্ত্বে যে সমস্ত গুঢ়তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য তাহার অন্যতম হইতেছে ইসলামের স্বরূপ ও যথার্থতা নফসের প্রশান্তির সহিত সম্পর্কিত– যাহা অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা হইতে সুরক্ষিত। আবার মোটামুটি এই ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসও দেখা যায় যে, ইমানের অবস্থান ভয় ও আশার মাঝখানে। আর আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'আল্লাহর কসম, আমার জানা নাই, যদিও আমি আল্লাহ্র রসুল, আমার এবং তোমাদের সহিত কি প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

টীকাঃ মাওলানা মোহাম্মদ আমিন বিন মাওলানা খাজা হোসেনী আল হরদী সুস্মাল লাহোরী হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান হইতে কান্দাহার নামক স্থানে তিনি বসবাস স্থাপন করেন। তিনি শায়েখ জয়নুদ্দিন খোয়াফী র. এর নিকট হইতে এলেম শিক্ষা করেন। আকবরের রাজত্বকালে তিনি হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং লাহোরের সন্নিকটে মূলকপুর নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি ৮৬ বৎসর জীবিত ছিলেন (নুযহাতুল খওয়াতির, ৫ম খণ্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা)।

জবাব ¾ প্রথমে জানিতে হইবে যে, নফসের প্রশান্তি হইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত আদেশসমূহের পরিপূর্ণতা, তাঁহার সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা এবং জান্নাত সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদানকারী বিষয়সমূহ। কিন্তু কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রশান্তি অর্জনের বিষয় স্থির করা হয় আলামত (লক্ষণ) সমূহ দ্বারা অথবা হৃদয়ের বিশ্বাস ও অনুভূতির মাধ্যমে এবং ইহার সব কিছুই কেবলমাত্র ধারণাপ্রসূত— যাহা আসল ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত নয়। বিশ্বাস তো ওহি এবং আম্বিয়াগণের সংবাদসমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্‌র কসম' অজ্ঞাত কোন কিছুর সমাপ্তির রীতিনীতি পূর্ণ নয়— কেননা আঁ হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নফসের প্রশান্তি ও তাঁহার সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিণতি তো সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও চির অমর। বরঞ্চ তাঁহার বক্তব্যের (এরশাদের) যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতেছে এই যে, ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যাহা আমার ও অন্যান্যদের সহিত দুনিয়া ও আখেরাতে সমাগত হইবে তাহা আমি জানি না– এই জন্য যে গায়েবের জ্ঞান (এলমেগায়েব) একমাত্র সেই পরম সত্য ও পবিত্র আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট বিশেষভাবে রক্ষিত।
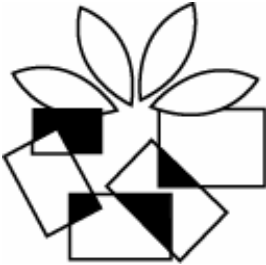
শায়েখ আব্দুল আহাদের নিকট লিখিত। মকতুব নং–৩০

প্রিয় পুত্র (ফরজন্দে আরজুমান্দ) আব্দুল আহাদ এই মিসকিনের নিকট জানিতে চাহিয়াছে যে, নামাজের সময় সালেক কোন বিষয়ের প্রতি নিজেকে নিবিষ্ট রাখিবে? সেই সর্বকর্তৃত্বময় প্রভুর প্রতি যিনি সেজদা ও উপাসনা গ্রহণ করার মূলে সদা বিরাজমান, নাকি মহা মহিমান্বিত কোরআনের প্রতি যাহা নামাজের প্রাণকেন্দ্র অথবা যেদিকে মুখ করিয়া সেজদা করা হয় সেই আল্লাহ্‌র ঘর কাবার দিকে? নাকি নম্রতা ও ভয়ভীতি সহকারে সর্বান্তঃকরণে নামাজের মূল বিষয়গুলির (আরকানের) প্রতি খেয়াল করিবে যাহা নামাজের সময় পালন করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে অথবা এই সমস্ত বিষয়গুলির প্রতি একই সঙ্গে মনোনিবেশ করিতে হইবে? আর ঐ সমস্তের মধ্যে প্রত্যেক ব্যাপারে কিছু কিছু দ্বিধা ও সন্দেহের মনোভাবও ব্যক্ত করা হইয়াছে।

হে সৌভাগ্যশালী। নামাজ যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহাদের জন্য যাহা নির্ধারিত ও জরুরী তাহা হইতেছে, নামাজের মূল বিষয়গুলির (আরকানের) প্রতি গভীর মনোযোগ রাখা, কওমা জলসা ইত্যাদিতে বিরামের দিকে খেয়াল রাখা এবং বিনীতভাবে ভয়ের (খুজু ও খুশুর) সঙ্গে নামাজ পাঠ করা। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করিয়াছেন, 'ঐ সমস্ত লোক সফলকাম হইয়াছে যাহারা তাহাদের নামাজ খুশু খুজুর সহিত সম্পন্ন করিতে পারে'। আর নামাজের মধ্যে খুশু হইতেছে, যেমন দাঁড়ান অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং এই রকমভাবে রুকু, সেজদা প্রভৃতির জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহে দৃষ্টি নিয়োজিত রাখা । ইহার সঙ্গে কোরআন শরীফের কেরাতের প্রতি মনোযোগ এবং তাহার অর্থ ও ভিতরের মর্মবাণীর প্রতি খেয়াল করিতে হইবে। (যদি সে অর্থ বুঝিতে সক্ষম হয়) অন্যথায় ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র কোরআনের বাণী (কালাম) এইটুকু খেয়ালে থাকাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্‌র জাতের প্রতি খেয়াল করা নামাজের জন্য নির্ধারিত নিয়মের মধ্যে নয়। তৎসত্ত্বেও আমি বলিতেছি যে, উপরে বর্ণিত (খুশুর অর্থ বর্ণনা করিবার সময় আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি) বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল করিলে, নাম ও গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যাঁহাকে আমরা সেজদা করি তাঁহার প্রতিই খেয়াল করা হয়।

টীকাঃ মখদুমজাদা শায়েখ আব্দুল আহাদ র. ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর প্রপৌত্র হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ সেরহিন্দী র. এর পুত্র এবং হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী র. এর ভ্রাতুস্পুত্র। তিনি প্রথমে তাঁহার পিতার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন এবং পরে নিজ চাচা হজরত খাজা মোহম্মদ মাসুম র. এর নিকট হইতে খেলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি হুজ্জতুল্লাহ্ শায়েখ খাজা মোহাম্মদ নকশ্‌বন্দ ইবনে খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর নিকট হইতেও বহু বাতেনী জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বহু পুস্তকের রচয়িতা এবং একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে এবং তাঁহার রচনাবলী হইতে পৃথিবীর বহু ব্যক্তি প্রভূত উপকার ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ১১২৭ হিজরীর ২৭শে জিলহজ্জ্ তারিখে শুক্রবারে তিনি দিল্লীতে ওফাত প্রাপ্ত হন। সেরহিন্দে তাঁহার দাফন সম্পন্ন হয় (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া)।

শায়েখ আবুল কাশেমের
নিকট লিখিত। মকতুব নং–৩১

বন্ধুগণের ঔদ্ধত্য ও নাস্তিকতায় বিষণ্ন হইও না। সমস্ত কিছু হকতায়ালার তরফ হইতেই হয় বলিয়া জানিবে। সমস্ত বান্দার মন আল্লাহ্‌তায়ালার কবজার মধ্যে, তিনি যে দিকে ইচ্ছা করেন, সেইদিকে তাহা ঘুরাইয়া দেন।

শত্রুরা তো দেখবে তোমার ক্ষতির কারণ খুঁজি
সাথে বন্ধুরাও যদি জোট বাঁধে সেই বিপক্ষের সাথে
খোদার ইচ্ছাতে সব কিছু ঘটে এইটুকু শুধু বুঝি
শত্রু মিত্র সবার মনতো বাঁধা আল্লাহ্‌র হাতে।

যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে তোমাকে আল্লাহ্‌তায়ালার দিক হইতে সরাইয়া রাখিয়া নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতে চায়। আর তোমার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব রাখে না (প্রকৃতপক্ষে) সে তোমাকে হকতায়ালার দিকে মশগুল থাকার সুযোগ প্রদান করে। আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে নিবিষ্ট থাকা উত্তম, নাকি সৃষ্ট জীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা?

জনৈক কবি কি চমৎকারভাবেই না বলিয়াছেন ঃ–
এই নিখিল বিশ্বকে হে আল্লাহ, তুমি আমা হতে
বিরূপ বিমুখ কর, যেন তারা আমার হিংসায়
সদা মত্ত থাকে; অস্তিত্বের কীর্তি মোর পথে পথে
মখলুকে মখলুকে হোক লুপ্ত, যেন নির্দ্বিধায়
দুনিয়ার সব কিছু থেকে পারি ফিরাতে এ মুখ
চতুর্দিক হতে যেন ফিরে আসে এ মন আমার–
বিনিময়ে দাও তোমার অমর প্রেম-ভরা বুক
অন্তরে বিরহ আর বাহিরে মিলন অভিসার।

শায়েখ আবুল কাসেমের
নিকট লিখিত। মকতুব নং–৩২

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা। তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তুমি নিজের মধ্যে আপোষ, শান্তি ও মীমাংসার বিষয়ে লিখিয়াছ। ইহা খুবই ভাল কথা। শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন যত নিভিয়া যায় ততই উত্তম। বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ মানবিক কোন দুর্বলতার কারণে অপরাধ হইয়া যায় এবং বন্ধুত্ববিরোধী বাদ-প্রতিবাদের কোন ঘটনাও ঘটিয়া যায়। এই সমস্ত ভুলক্রটিকে ক্ষমার চক্ষে দেখা উচিত এবং বন্ধুদের গুণাবলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরান দরকার।

নিহিত প্রজ্ঞাকে তব অন্তরের সাথে যুক্তকরি
পরিচয় দিও প্রকৃত জ্ঞানীর ও বুদ্ধিমানের।

কোন এক ব্যক্তি জনৈক বুজুর্গের সম্মুখে অপর এক ব্যক্তির নিন্দা করিতেছিল। তাহা শুনিয়া এ বুজুর্গ বলিয়াছিলেন, দেখ, আমার দৃষ্টি তো কেবল ঐ ব্যক্তির ভালো দিকগুলির প্রতিই নিবদ্ধ আছে যাহা তাহার দোষক্রটি অপেক্ষা অনেক বেশী। আমরা যেন তাহার ভাল গুণগুলি গ্রহণ করি এবং যাহা কিছু নিন্দনীয় তাহা ক্ষমা ও বর্জন করি। বন্ধুগণে সৎগুণাবলীর দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত।

মনিব তাঁহার গোলামের সঙ্গেও এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আচার আচরণ করিয়া থাকেন। গোলামের যে গোলাম তাহার সঙ্গেও এই প্রকার উত্তম আচরণ করা দরকার। তুমি লিখিয়াছ যে, 'কোন কোন সালেক' খবরগুলি আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে এবং উত্তম ধারণার বশবর্তী হইয়া আপনি সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন এবং মনে মনে দুঃখিত হইয়াছেন। শিক্ষিত লোকদের নিকট হইতে এই ধরনের কথাবার্তা কেবল বিস্ময়ের উদ্রেক করে। লাগানো ভাঙ্গানোর কথা যাহারা বলে, তাহাদের কথা উত্তম ধারণার বশবর্তী হইয়া স্বীকার

করিয়া লইলে অন্যদিকে প্রকৃতপক্ষে যে উত্তম ধারণার যোগ্য ছিল তাহাকে সেই উত্তম ধারণা হইতে বঞ্চিত করা হয়।

দেখ যে ব্যক্তি চোগলখোরী করে তাহার কথাবার্তা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। চোগলখোরকে বিশ্বাস করা চোগলখোরী করা অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় কাজ– কারণ চোগলখোরী করা মানে দালালী করা, আর তাহা স্বীকার করার অর্থ হইতেছে তাহাতে সম্মতি প্রদান করা। ইহা স্পষ্ট যে, দালালী যে করে এবং তাহা যে স্বীকার করে, তাহারা দুইজনে সমান হইতে পারে না (দুইজনের তুলনায় যে স্বীকারকারী সে অবশ্যই অধিক মন্দের ভাগী হইবে)।

হিম্মৎ খানের নিকট লিখিত।
মকতুব নং– ৩৩

কেবলমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কিছুর গোলামী হইতে আল্লাহ্পাক তোমাকে মুক্তি প্রদান করিয়া নিজ ইচ্ছায় যেন তিনি তোমাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করেন। দেখ, আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই এবং মানুষকে তাহাদের মর্জির উপরও তিনি ছাড়িয়া দেন নাই যে, তাহারা যাহা বুঝিবে সেইমত এবং খেয়ালখুশী অনুযায়ী যাহা করিতে তাহাদের মন চাহিবে সেইমত জীবন অতিবাহিত করিবে। আঁইয়াহ্ছাবুল আঁই ইউতরাকা ছুদা অর্থাৎ মানুষ কী এইরকম চিন্তা করে যে তাহাদিগকে এমনি অর্থহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে (কোরআন)। মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হইতেছে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশসমূহ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাঁহার দাসত্ব করা যাহার ফলে তাঁহার মারেফত লাভ করা যায়। কোন কোন বিষয়সমূহ প্রতিপালন করার জন্য তিনি আদেশ করিয়াছেন এবং কোন কোন বিষয় সম্পর্কে নিষেধ করিয়াছেন। যদি এই সমস্ত আদেশ ও নিষেধকে অমান্য করিয়া কেহ (নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া) জীবন যাপন করে তাহা হইলে তাহার ঔদ্ধত্যের জন্য তাহাকে নাফরমান বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে এবং আল্লাহ্তায়ালার ভয়াবহ গজব ও আজাবের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। শেষ দিনের সেই ভয়ঙ্কর শাস্তি অবধারিতরূপে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ইন্না আজাবা রাব্বুকা

লাওয়াকিউম মালাহু মিন্ দাফিই– নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি অবশ্যই সম্পন্ন হইবে, কেহ তাহা পরিহার করিতে পারিবে না (কোরআন)।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচালনার অধীনে মানুষের জন্য তাহার মাথার উপরে অনেক পরিদর্শক (ফেরেশতা) নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের (মানুষের) যাবতীয় কথা ও কাজ এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও শক্তি প্রয়োগের দলিল সুরক্ষিত থাকে এবং তাহার আমলনামা তৈরী হইতে থাকে। হায়, অন্ধকারে পতিত বিপদগ্রস্ত হতভাগ্য পাপী মানুষ কোন উচ্চপদস্থ সরকারী পরিদর্শক কোন এলাকায় হাজির হইলেই তো সেখানকার বাসিন্দারা ভয়ে কাঁপিতে থাকে এবং যে কোন অন্যায় ও খারাপ কাজ হইতে দূরে সরিয়া থাকে। আর এখানে আল্লাহ্তায়ালার এইসব পরিদর্শক (ফেরেশতা) তাঁহাদের দিনের কার্যাবলী রাত্রে এবং রাত্রের কার্যাবলী প্রাতেঃ সেই সমস্ত-সম্মানের মালিক মহাসম্মানীয় প্রভুর নিকট পেশ করে। তবু আমাদের মত গাফেলদের কোন বোধোদয় হয় না এবং আমরা হুঁশিয়ার হইতে পারি না। উপরন্তু আরও অধিক পরিমাণে পাপ কার্যে লিপ্ত হইয়া কেবল অবাধ্য আর বেপরোয়া হইতে থাকি।

টীকাঃ হিম্মত খান মীর ঈসা ছিলেন আসলাম খান বদখশীর পুত্র। আলমগীর র. এর তত্ত্বাবধানে তিনি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন। তিনি অতিশয় সুন্দর আকৃতির, পবিত্র স্বভাবের ও উদার চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতের শুভাকাঙ্খী ছিলেন। সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার আচার ব্যবহার সকল সময় মার্জিত ও মনোরম ছিল। এই কবিতা তিনিই রচনা করিয়াছিলেনঃ–

যতনে রাখিও গাঁথি প্রেমভরা হৃদয়ে তাহার
প্রেমের একটি চিরস্থায়ী কাঁটা,
ইহা ছাড়া প্রেমের মরুতে মজনুর মনে আর
ছিল নাক কোন কাঁটা, ছিল শুধু প্রেম দুর্নিবার।

আলমগীর র. এর দরবারে তাঁহার পিতার প্রভাব পূর্ব হইতেই ছিল। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার নিজ দক্ষতায় তিনি শাহী দরবারের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ্ আলমগীরের সিংহাসন আরোহণের ৬ষ্ঠ বৎসর পূর্তির সময় তাঁহার পিতা আগ্রার সুবেদারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি আগ্রার ফৌজদারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কর্মস্থলে বৎসরে বৎসরে তিনি উন্নতি সাধন করিতে থাকেন এবং এলাহাবাদের সুবেদারী পর্যন্ত তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ আলমগীরের রাজত্বের চব্বিশ বৎসর পূর্তিকালে আজমীর শহরের প্রধান সেনাপতির মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদে আসীন হইতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ঐ একই বৎসরে আজমীর শরীফের হেফাজতের জন্য আলমগীর র. তাঁহাকে তত্ত্বাবধানের কাজে আজমীরের কেল্লায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ৫ই মহররম, ১০৯২ হিজরী সনে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি পরিশ্রমের বিনিময়ে উপার্জনশীল ছিলেন। সমসাময়িক কালের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সুবক্তা ও ভাষার সৌন্দর্যের জন্য স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দী ভাষাতেও তিনি কবিতা বলিতেন। লেখক হিসাবে তিনি 'মীরন' ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন। (মাখুজআয্ মাইসারুল উমরায়ে, দ্বিতীয় খণ্ড)।

মাত্র কয়েক দিনের এই জীবন আমাদের নিকট খুবই প্রিয়। এই সুযোগ আল্লাহ্তায়ালার দান ও আশীর্বাদস্বরূপ। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, মূল ও মৌল কার্যাবলীর মাধ্যমে তাহা খরচ করা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইবে, যদি এই প্রিয় জীবন কেবল বেহুদা ও শুধু অকাজের মধ্যে কাটিয়া যায়। একটু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিলেই সেই চিরস্থায়ী জগৎ আমাদের করায়ত্ব হইতে পারে এবং সামান্য অবহেলা ও গাফলতির কারণে তাহা আমাদের নাগালের বাহিরেও চলিয়া যাইতে পারে। সকল সময় বেশী করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করাই হইতেছে আমাদের প্রধান কাজ। পরহেজগারী ও ধর্মভীরুতা (তাকওয়া) হইতেছে সকল সৎ কার্যাবলীর উদ্দেশ্য। দেখা যাক, কোন জওয়ান তাহার আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য আয়েশসামগ্রীর সুখ-সওদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলেমার সত্যকে হৃদয়ের সুরতরঙ্গে শ্রবণ করিয়া এই অর্থহীন উপদেশ খানিকে আত্মার সহিত সংযুক্ত করিয়া কবুল করিতে পারে কিনা–

দিলাম তোমাকে আমি অফুরন্ত ভাণ্ডারের
দিকচিহ্ন আর পূর্ণ পরিচয়,
যদি না পারি পৌঁছাতে কখনও সেখানে আমি
পৌঁছে যাবে হয়ত তুমি নিশ্চয়।

মোহাম্মদ মাসুদ র. এর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৩৪

মহব্বতের সঙ্গে যে সুন্দর পত্রখানি পাঠাইয়াছিলে তাহা পাঠ করিয়া প্রীত ও আনন্দিত হইয়াছি। তুমি তোমার মস্তিষ্কে দুর্বলতার প্রভাব সম্পর্কে লিখিয়াছ। আল্লাহ্তায়ালা যেন তোমাকে দ্রুত আরোগ্য ও শক্তি দান করেন। দুর্বলতার কারণে যদি জিহ্বা দ্বারা জিকির (জিকিরে লিসান) করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে কলবের মাধ্যমে জিকির ও অন্তরের খেয়ালের মধ্যে অধিক মশগুল থাকিবে। খেয়াল কাহাকে বলে তাহা জান কি?

মোহের ফাঁদে আর কতকাল রইবে ভুলে হকতা'লাকে
বাতিল থেকে ফিরাও হৃদয় এবার তুমি হকের দিকে।

মিথ্যা হইতে সত্যের দিকে প্রত্যাগমন করাই হইতেছে ধ্যান বা খেয়াল। সর্বপ্রথমে আল্লাহ্‌পাকের এবাদত ও তাঁহার মোরাকাবা করাকে সমস্ত খেয়ালের সারাংশ বলিয়া জানিবে। ইহা সর্বনিম্ন পর্যায়ের জ্ঞান হইতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানের দিকে প্রবাহিত করে, প্রমাণপত্র হইতে প্রমাণের দিকে অভিনিবিষ্ট করে, প্রতিবিম্ব হইতে মূলের দিকে আকৃষ্ট করে, প্রশংসা ও গুণাবলী হইতে মাহাত্মের (শানের) দিকে এবং মাহাত্ম্য হইতে সেই মাহাত্মের মালিকের নিকট পর্যন্ত পৌঁছানোর সফলতা আনয়ন করে। মোট কথা, জিকিরের উদ্দেশ্য হইতেছে গাফলতীকে বিতাড়িত করা। যে কোন উপায়েই হউক না কেন, গাফলত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আর সৎ উদ্দেশ্যের (নিয়তে সালেহা) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন কাজ, তাহা ক্রয়-বিক্রয় হউক বা এই ধরনের যে কোন কাজ হউক না কেন, সব কিছুই জিকিরের সামিল হইয়া যায়। সঠিক উদ্দেশ্যে সম্পাদিত দুনিয়াদারীর সকল কাজকর্মও মিলিতভাবে জিকিরে পরিণত হয় এবং তাহা দ্বারা চিরস্থায়ী অন্তর্দৃষ্টি হাসিল হইয়া থাকে।

সংসারের দায় দেনা সুখ শান্তি উপার্জন
মিশে গেছে এক হয়ে মোর কাছে এখন;-
শুধু সেই প্রেমিকের চিন্তাটুকু আছে বাকী
তরল আবেহায়াত যেথা পাকা হয়ে উঠে
হৃদয়ের পানপাত্রে যবে তারে ধরে রাখি;–
উন্নতির সিঁড়ি তার কাছে কেবল আসুক ছুটে।

মখদুমজাদা শায়েখ মোহাম্মদ আশরাফের নিকট লিখিত। মকতুব নং– ৩৫

তোমার আনন্দদায়ক পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। নিজের বাতেনী ও জাহেরী অবস্থার কথা এইভাবে মাঝে মাঝে লিখিয়া জানাইবে। ইহা অদৃশ্য (গায়েব) হইতে অন্তরের মনোযোগ (তাওয়াজ্জোহ্) আকর্ষণ করার জন্য সেতুবন্ধ রচনা করে। তুমি লিখিয়াছ যে, ফরজ ও তাহাজ্জুদ নামাজের মধ্যে এমন এক বিশেষ আবেশ ও আনন্দদায়ক মত্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই অবস্থার সৃষ্টি হইলে ইচ্ছা হয়, দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া নামাজে নিমগ্ন থাকি। ফজরের পরিব্যপ্তিকালেও প্রায় এই অবস্থার বিকাশ ঘটে।

অত্যন্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ। এই মিষ্টি আবেশ ও প্রফুল্লময় মত্ততা যাহা নামাজের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ফরজ নামাজের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাহা প্রকৃত আনন্দদায়ক মত্ততার মূল উৎস। সেই সঙ্গে অন্য সময়েও নামাজের সময়ের মতো সুখদ অবস্থার উৎকর্ষতা বজায় থাকিতে পারে। দীর্ঘ কেরাতের সহিত নামাজ পড় এবং রুকু সেজদাও প্রলম্বিত কর। মাঝে মাঝে কোন ফরাশ বা বিছানা ছাড়া খালি জমিনের উপর নামাজ পড়িবে এবং নিজের পেশানীকে মাটির সহিত সম্পৃক্ত করিবে। কখনও কখনও জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া জনমানবহীন স্থানে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া খুব খুশু ও রগ্‌বতের সহিত (নফল) নামাজ পড়িবে। কলেমা তৈয়েবার ক্রমাগত আবৃত্তির জন্য নিজেকে সর্বদা অদম্য ও উৎসাহী রাখিবে। ব্যক্তিগত বাসনা ও প্রার্থনাসমূহের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবে এবং প্রতিবিম্ব হইতে মূলের দিকে আসক্ত হইয়া যাইবে। তুমি স্বপ্নে রসুলে মকবুল সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ এবং দেখিয়াছ যে, আঁ-হজরত স. তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন আর তুমি নিজের জবানীতে বলিয়াছ, ইয়া রসুলাল্লাহ্ খালা বিহইয়াদিই ইয়া শাফিউল মুজনেবিন খালা বিইয়াদিই।

ইয়া রসুলুল্লাহ আমি যে ক্ষুদ্র অতি
রিক্ত সহায় সম্বলহীন,
তবু সাধ জাগে তোমার শাফায়াতের
হে শাফিউল মুজনেবিন।

এই স্বপ্ন অত্যন্ত মোবারক স্বপ্ন এবং আগাগোড়া স্বর্গীয় ও সুসংবাদবাহী। এই আশা হইতেছে যেন ইহা পরকালের মুক্তির অসিলা এবং উচ্চ মর্যাদার জন্য মুক্ত বাতায়নস্বরূপ হইয়া যাইবে।

ওয়াস্‌সালাম।

মখদুমজাদা শায়েখ মোহাম্মদ আশরাফের নিকট লিখিত। মকতুব নং– ৩৬

যে মূল্যবান পত্রখানি তুমি এই মিসকিনের নামে পাঠাইয়াছিলে তাহা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ রহিয়াছ এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকারীর স্মরণ হইতে নিজেকে কখনও বিরত রাখ নাই, সেজন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তুমি বিশিষ্ট সংযোগ (খাস্ নেসবত) সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ এবং হাজেরীন (উপস্থিত) সঙ্গী-সাথীদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছ।

দেখ, আমি তোমার নিকট হইতে কোন জিনিস দূরে সরাইয়া রাখি নাই। তোমার ব্যাপারে কার্পণ্যতা আর অনুদারতা করা হয় নাই। বরঞ্চ তোমার দিকে সর্বদা দৃষ্টি খোলা রাখি এবং তোমার উন্নতির আকাংখা পোষণ করি। এই পত্র লিখিবার সময়েও তোমার প্রতি মনোযোগ (তাওয়াজ্জোহ্) দেওয়া হইল, তুমি মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় প্রকাশ পাইতেছ এবং দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে, তোমার আলোকরশ্মি সৃষ্টিজগতকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তুমি খানকার হাজেরীনদের সহিত যে প্রতিযোগিতা করিতেছ তাহা উত্তম ও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তুমিও শ্রেণী বিন্যাসের দিক হইতে এমন কিছু কম নহ, নিজ সঙ্গী সাথীদের মধ্যে তুমি বিশিষ্ট। তবে হ্যাঁ, কোন কোন ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্য যোগ্যতাবলে অর্জিত হয় তাহা স্বতন্ত্র ব্যাপার এবং সকল আলোচানার ঊর্ধ্বে। প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন যোগ্যতা অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়া থাকে।

সৎ অসতের পরিচয় কর্মে থাকে লেখা,
যুগ যুগ ধরে তাকে কাজ দিয়ে হয় দেখা।

তুমি যে দৌলত অর্জন করিয়াছ, অধিকাংশ লোক তাহা হইতে এখনও বঞ্চিত রহিয়াছে। যে সমস্ত বিষয় লাভ করিবার জন্য তোমার সমসাময়িক সাথীগণ এখনও দম ফেলিবার অবকাশ পাইতেছে না এবং তাহা হাসিল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, বহুপূর্বেই তুমি সে-সমস্ত বিষয়ে যোগ্যতার অধিকারী হইয়াছ। যে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যসমূহ (ফয়েজ ও বরকত) তোমার সহবতের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্যদের মধ্যে তাহা প্রতীয়মান নহে। তোমার সম্পর্কে যাহা প্রতীয়মান হইতেছে তাহাই তোমার পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। তোমার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে যাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহাই তোমার বৈশিষ্ট্য এবং সমৃদ্ধময় পোশাকের (লেবাসে ফয়েজ) মধ্যে তোমার সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়া উঠে।

তোমার মুরিদের মধ্যে তুমি দুইজন মুরিদের অবস্থা সম্পর্কে চিঠিতে যাহা লিখিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া সীমাহীন খুশী হইয়াছি– হে আল্লাহ, তুমি তাহাদিগকে ঊর্ধ্বে আরোহণ করাও। মীর আব্দুল্লাহর অবস্থা অন্য তালেবের তুলনায় অধিক উন্নত। তবে এ কথা যেন খেয়াল থাকে যে, এই ধরনের কার্যাবলী যখন আল্লাহ্‌র অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন কখনও তাহা যোগ্যতার ভিত্তিতে হইয়া থাকে, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রকম দেখা যায় যে, প্রতিফলনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যাহাতে তাহার নিজস্ব যোগ্যতার পরিমাণ সেরকম থাকে না। যাহাই হউক না কেন, তবু তাহা অনন্যসাধারণ ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

যাহারা হেদায়েতের পথে চলে এবং নবী করিম স. এর সুন্নতের অনুসরণ করে তাহাদের সকলের প্রতি সালাম।

টীকাঃ শায়েখ মোহাম্মদ আশরাফ র. ছিলেন খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর চতুর্থ পুত্র। ১০৪৮ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মীয় বিষয়সমূহে তিনি পূর্ণ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তিবিদ্যায়, ইতিহাসে, ফিকাহ্‌শাস্ত্রের (শরীয়ত সম্পর্কিত আইন) বিভিন্ন শাখায়, দর্শনে এবং তফসির ও হাদীসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বহু বিখ্যাত গ্রন্থের উপক্রমনিকা ও পাদটীকাসমূহ লিখিয়াছেন। নিজ পিতার নিকট বায়াত হওয়ার পর তিনি মরুদ্যানের পথসমূহ পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে মোজাদ্দেদিয়া তরিকাকে তিনি পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২রা সফর, ১১১৭ হিজরীতে তিনি এই নশ্বর জগৎ হইতে অনন্তলোকে যাত্রা করেন। তাঁহার সম্মানিত পিতার কবরের সংলগ্ন পশ্চিমদিকে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার অন্তিম সময়ে তিনি বার বার 'হাসবী আল্লাহ্, ওয়া নেয়ামুল ওয়াকিল' পাঠ করিয়াছিলেন। (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া-দ্বিতীয় খণ্ড)।